অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(দ্বাত্রিংশতম খণ্ড)

—: * :—

(১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

চারিদিকে চলিয়াছে তুমুল হরিওঁ-কীর্ত্তন আর তেমন সময়ে গর্ভধারিণীকে কোনও কষ্ট না দিয়া অনায়াসে তোমার শিশুপুত্র ভূমিষ্ঠ হইল, ইহা বড়ই আনন্দজনক সংবাদ। আশীর্ব্বাদ করি, এই শিশু সুস্থ দেহে দীর্ঘায়ু হইয়া জগতের কল্যাণ বিধান করুক।

বাঁকুড়া ও সোনামুখী মণ্ডলী হইতে তোমাদের ভ্রাতা ও ভগিনীরা আসিয়া তোমাদের গ্রামে নানাবিধ পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া যাইতেছেন আর তোমরাও নিজেদের গ্রামের

ভ্রাতা ও ভগিনীদের নিয়া চতুর্দ্দিকের নানা গ্রামে অনুরূপ কাজ করিয়া চলিয়াছ জানিয়া খুবই সুখী হইয়াছি। যদি তোমরা অব্যাহত বিক্রমে ধারাবাহিক প্রযত্নে সুদীর্ঘকাল—ধর, তিন চারি পাঁচ বৎসর—একাজ অধ্যবসায় সহকারে এবং পরমোৎসাহে করিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে তোমরা যে সুদীর্ঘ ভাবী কালের জন্য এক মনোরম ইতিহাসের ভিত্তি-প্রস্তর গাঁথিয়া যাইতে পারিবে, এই বিশ্বাস অনায়াসে এবং সঙ্গত ভাবে রাখিতে পার। পুপুন্কীতে এই যে আমি একটার পর একটা করিয়া ক্ষুদ্র বাসগৃহ বা বৃহৎ জলাশ্রয় করিয়াছি, তাহার একটাও দশ, বারো, চৌদ্দ বৎসরের কম শ্রমে নির্ম্মিত হয় নাই। ধৈর্য্য ধরিয়া কাজ করিয়া গিয়াছি বলিয়াই এমন অনাতিথেয় পরিবেশেও আস্তে আস্তে সুরম্য এক নবদৃশ্যের অবতারণা সম্ভব হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। তোমরা হুজুগে বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিও না, ধৈর্য্য ধরিতে শিক্ষা কর। ধৈর্য্যশীল মানুষ দ্রুতকর্ম্মাও হইতে পারে, ধীর কর্ম্মাও হইতে পারে, কিন্তু অল্প অল্প করিয়া করিতে থাকিলেও সে কাজে লাগিয়া থাকে, কোনও অবস্থায় কাজ হইতে হাত গুটাইয়া নেয় না। যে কাজ ক্ষুদ্র ভাবে ধরিয়াছ, সে কাজেরই পরিসমাপ্তি অতীব বৃহৎ রূপ ধরিয়া হইবে, যদি শুধু লাগিয়া থাক। সকলকে লাগিয়া থাকিবার জন্য কেবল প্রেরণা দিয়া যাও, কেহ কম কাজ করিল বলিয়া অভিযোগ করিও না।

তবে, একটা কথা এই বলিব যে, ধৈর্য্যশক্তির উন্মেষ অতি দ্রুত হয় ব্রহ্মচর্য্যের সফল সাধনার দ্বারা। বিবাহিত, অবিবাহিত, বিপত্নীক, বিবাহিতা, কুমারী, বিধবা নির্ব্বিশেষে আমার প্রত্যেকটী কর্ম্মী নিজ নিজ জীবনে সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মচর্য্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যাপারে

বিশেষ ভাবে যত্নশীল হও। ব্রহ্মচর্য্য তোমাদের বর্ম্ম। বর্ম্মহীন সৈনিক অতি সহজে শত্রুর কাছে নত হইয়া পড়ে বা অকালে প্রাণত্যাগ করে। লম্ফ-ঝম্ফ, আস্ফালন বা বচন-চাতুরী তোমাদের অস্ত্র নহে, তোমাদের অস্ত্র শুদ্ধ চিন্তা, স্বচ্ছ চিন্তা, স্বার্থগন্ধলেশহীন শুভ্র ও সুন্দর চিন্তা। চিন্তার শক্তিতে তোমরা জগৎ জয় করিবে, বক্তৃতার বহ্বাস্ফোটনে নহে। বক্তৃতা শক্তিই যদি আমাদের লক্ষ্য লাভের উপায় হইত, তবে বিধাতা আমাকে যে বাগ্মিতা-বলটুকু দিয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে আমি কি কৃপণ হইতাম? আমার নিজের মত বা পথ প্রচারের জন্য আমি কদাচ কোনও ভাষণমঞ্চে দাঁড়াইয়া নিজের বাগ্মিতাশক্তির ব্যবহার করি নাই। একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলা ছাড়া বাংলার সব জেলায় আমি গিয়াছি এবং বলিয়াছি শুধু সেই কথাগুলি; যাহা মানুষের জানা প্রয়োজন কিন্তু যাহার সহিত আমার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের কোনও সম্পর্ক নাই। সম্প্রদায়-বিস্তার আমার লক্ষ্য নহে, মানুষ সৃষ্টিই আমার একমাত্র অভীপ্সিত। কিন্তু তোমরা নিজ নিজ পল্লী অঞ্চলে যাহা করিতেছ, তাহা বাস্তব প্রস্তাবে হইতেছে আমার মত, আদর্শ ও ধর্ম্মপ্রচার।

ধর্ম্মপ্রচার কথাটার প্রকৃত মানে হইতেছে আচরণ প্রচার। আমাদের জীবনের যাহা আচরণ, তাহা যদি শুদ্ধ হয়, সাত্ত্বিক হয়, সংযম-সুন্দর হয়, সত্যানুসারী হয়, তবেই সেই আচরণ অন্যের পক্ষে গ্রহণীয় ও অবলম্ব্য হইতে পারে। এই জন্যই তোমাদিগকে বারংবার বলিতেছি যে, যে যতটুকু পার, নিজ নিজ জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের অনুশীলন করিয়া যাইতে থাক। তাহা হইলেই তোমাদের তুচ্ছ কথা বা মৃদু কণ্ঠস্বরও

বজ্রধ্বনির ন্যায় অবারণীয় ভাবে প্রত্যেকটী শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করিবে এবং অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি আমার নিজের লেখারই অর্থ অনেক সময়ে করিতে পারি না, যে যে ভাবে যাহা বোঝে তাহার উপরে ছাড়িয়া দেই। এমতাবস্থায় অন্য আর একজনের লেখা বাক্যের বা বাক্যসমষ্টির কি ব্যাখ্যা হইবে, তাহা লেখা কি সহজ ব্যাপার? সুতরাং বলিতেছি যে, কাহারও লিখিত কোনও রচনার অর্থ বুঝিতে হইলে একটু কষ্ট করিয়া তাহা বারংবার পড়িও। বারংবার পাঠ করিতে করিতে অখণ্ড একটী বিরাট বাক্যের ভিতরে খণ্ড খণ্ড, টুকরা টুকরা, ছোট ছোট অনেকগুলি বাক্যের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারিবে এবং লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবে যে একটা বাক্যে এত রকমের কথা নানা আনাচে-কানাচে লুকাইয়া থাকিতে পারে। তুমি এক ভদ্রলোকের লেখা যে বাক্যটীর ব্যাখ্যা জানিবার জন্য পত্র দিয়াছ, সেই বাক্যটীর প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিলে সুনিশ্চিতই যাহা পাইবে, তাহা পর পর আমি লিখিয়া যাইতেছি।

প্রথমেই পাইবে যে, মানুষের হৃদয়ে ভগবান্ আছেন। তারপরেই পাইবে যে তিনি সেখানে সুপ্ত অবস্থায় আছেন। তারপরে পাইবে যে তিনি জাগিয়া ওঠেন এবং মানুষের কাছে ধরা দেন। তারপরে পাইবে যে তাঁহাকে এই জাগ্রৎ অবস্থায় পাইতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য এবং সাধনা সহায়তা দান করে।

উপরে যাহা লিখিলাম, এই কথাগুলি আবার মনে মনে বারংবার পর্য্যালোচনা করিতে করিতে দেখিবে যে, আরও কত প্রকারের নূতন কথা ঐ ক্ষুদ্র খনিটুকু হইতেই বাহির হইয়া আসিতেছে। খনির মাণিক ছোটই থাকে কিন্তু তাকে খনি হইতে তুলিয়া আনিবার জন্য শ্রমের প্রয়োজন। সেই শ্রম অতীব সুশৃঙ্খল ভাবে ধারাবাহিক প্রযত্নে বিনিয়োগ করিতে হয়। তাহারই নাম সাধনা।

কোনও-কিছুর অর্থ না বুঝিলে তার অর্থ বুঝিয়া নিবার সহায়তার জন্য একটী হিতকারী বান্ধব সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছেন। তিনি তোমার ভিতরেই থাকেন। তিনিই বুঝেন, বুঝান, দেখেন, দেখান, শোনেন, শোনান, করেন, করান। তাঁরই নাম ভগবান্। সদ্‌গ্রন্থ দেখিলেই তাহা বারংবার পাঠ করিয়া করিয়া আস্তে আস্তে তাহার অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিবে। অন্তরের ভগবান্ অন্তরে থাকিয়া তোমাকে সব বুঝাইয়া দিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ই পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ভগবানের নামে সর্ব্বরোগ সারে, একথা বিশ্বাস করিও এবং বিশ্বাসের অনুকূলে নিয়ত নামস্মরণ করিও। নাম তোমার বিশ্বাসকে গাঢ়তর করুক, বিশ্বাস তোমার নামকে রসাল ও মধুর করুক। অবিশ্বাস করিয়া নাম করিলেও নাম তাহার ফল দিবেই দিবে, সংশয়-সন্দেহ লইয়া নাম করিলেও নামের শক্তি আত্মপ্রকাশ করিবেই করিবে কিন্তু দ্বিধাহীন কুণ্ঠাহীন পরমনির্ভরনিষ্ঠ হইয়া নাম করিলে নামের ফল সদ্যঃ ও সুনিশ্চিত। নামকে জীবনের পরম মহৌষধ বলিয়া, পরম রসায়ন বলিয়া, পরম পরিপূরক অমৃতকুম্ভ বলিয়া জ্ঞান করিবে।

ভোগ-বাসনা মনকে চঞ্চল করিতে চাহিলে উদ্বিগ্ন হইও না। মনের স্বভাব চঞ্চলতা, দেহের স্বভাব ভোগবাসনা, দেহ রক্তমাংসে গড়া নিয়ত-বিকারশীল একটা ক্ষণভঙ্গুর আধার। উহার যাহা স্বভাব বা পরিণতি, তাহা হইতে উহাকে জোর করিয়া টানিয়া উর্দ্ধে বা অধোদেশে নামান এক সুকঠিন অধ্যবসায়। সে অধ্যবসায়ের ফল শুভ হইতে পারে, অশুভও হইতে পারে। সে অধ্যবসায় সফলও হইতে পারে, বিফলও হইতে পারে। উহাকে উহার নিজের ভাগ্যের উপরে ছাড়িয়া দিয়া তুমি একাগ্র মনে, একান্ত প্রাণে, আকুল অন্তরে, নিবিষ্ট হৃদয়ে পরম-প্রভুর পবিত্র নাম অবিরাম কেবল জপিয়া যাইতে থাক। অবিশ্বাসীরা যাহাই বলুক, নাম করিতে করিতে তোমার কামাবেগ, ভোগবুদ্ধির উদ্দামতা, প্রবল আসঙ্গলিপ্সা, অনবদম্য দুর্ব্বার লালসা আপনা আপনি সৌম্য, শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর, শোভন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নিকষিত হেমের ন্যায় নির্ভেজাল প্রেমে পরিণত হইবে। অফুরন্ত ভোগ রাজা যযাতিকে তৃপ্তি দিতে পারে নাই, পাশ্চাত্য জগতের যৌনতত্ত্বানুসন্ধিৎসু মনীষী-গণকেও দিতে পারিবে না। কামকে শান্ত করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ

কোটি কোটি পাশ্চাত্যকে এই দরিদ্র ভারতের নীবারকণাজীবী ক্ষীণকায় শীর্ণদেহ তপস্বীদেরই চরণ-প্রান্তে ছুটিয়া আসিতে হইবে। তোমরা এই কথা বিশ্বাস কর এবং নামে মজ।

রাজনৈতিক নানা আন্দোলনকারীরা মানুষের ঈশ্বর-বিশ্বাসকে যখন তাঁহাদের নানা নৃশংস ও নিষ্ঠুর কর্ম্মতালিকার প্রতিঘাতক বলিয়া মনে করেন, তখনই তাঁহারা তীক্ষ্ণ যুক্তির কুঠার হস্তে অরণ্যের মহাবৃক্ষসমূহ ছেদন করিতে নামিয়া যান। ইহা তাঁহাদের সাময়িক প্রয়োজন, প্রকৃত লক্ষ্য নহে। কিন্তু তাঁহাদের কথা শুনিয়া তোমার ঈশ্বরবিশ্বাস পরিহার করিবারও প্রয়োজন নাই, নামে নিষ্ঠা ত্যাগ করিবারও দরকার নাই। তুমি সর্ব্বাবস্থায় নাম করিয়া যাও। নাম কর প্রকাশ্যে, নাম কর গোপনে, নাম কর সরবে, নাম কর নীরবে, নাম কর সর্ব্বকর্ম্ম পরিহার করিয়া, নাম কর প্রতিটি কর্ম্ম করিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে, নাম কর মরণ-পথে যাত্রা-কালে, নাম কর বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা-কালে, নাম কর জাগ্রতে, নাম কর নিদ্রায়, নাম কর সজ্ঞানে, নাম কর অজ্ঞান অবস্থায়, এমনকি স্বপ্নেও, নাম কর আত্মহিতার্থে, নাম কর বিশ্বজনকুশলার্থে, নাম কর সকাম ভাবে, নিষ্কাম ভাবে, স্বার্থে এবং পরার্থে, নাম কর মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, নাম কর দেহ দিয়া, কণ্ঠ দিয়া, নাম কর একাকী, নাম কর বহুজন-সমন্বয়ে। যে যে ভাবে পার, নাম করিয়া যাও। নাম নিত্য সত্য। নাম করিলেই তাহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৬ই পৌষ, শনিবার, ১৩৮০
(২২-১২-৭৩)

পরমকল্যাণভাজনেষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও ।

ভাবিয়াছিলাম, পুপুন্‌কী ফিরিয়া তোমাকে একটা খুব ভাল খবর দিতে পারিব যে, তোমাদের প্রদত্ত প্রায় সাত শত তালবীজের প্রত্যেকটাই মৃত্তিকাগর্ভে নিরাপদে আছে এবং আগামী বৎসর পুনরায় তোমাদিগকে তালবীজ সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হইবে না । কিন্তু হায় বিধি, পুপুন্‌কী আসিয়া দেখিলাম, নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আশ্রমের কর্ম্মী ছেলেদের দ্বারা বিভিন্ন সীমায় যে বিপুল পরিমাণ দৈর্ঘ্যে এতগুলি তালবীজ বপন করাইলাম, তাহার প্রতিটি গর্ত্ত শূন্য, বীজ নাই, ফোঁপড়া খাইবার লোভে চারিদিকের গ্রামের ছেলেরা রাত্রি করিয়া একটী একটী তুলিয়া নিয়া যথোচিত সৎকার করিয়াছে । আমের বীজ পুতিয়া বীজু চারা রক্ষা করিতে পারি না, কাঁঠালের গাছ পুতিয়া তাকে বড় সড় করিবার পরে হঠাৎ অজ্ঞাত কুঠারের ঘায়ে তাকে দ্বিখণ্ডিত হইতে হয়, এই জাতীয় ঘটনা আজ ৩০।৩৫।৪০ বছর ধরিয়া চলিয়াছে। গ্রামের অভিভাবকদের এই বিষয়ে একটু নজর দিতে বলিলে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হন। এ যে শ্রীরামচন্দ্রের আমলের দণ্ডকারণ্যের চেয়েও শোচনীয় অবস্থা। আশ্রমের কর্ম্মীরা বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহারা আর বীজ বপন করিবে না, আর চারা উৎপাদন করিবে না। আমি বলি কি, অধীর হইয়া লাভ নাই। সম্মুখ-সমরে উন্মুক্ত

তরবারির মুখে আত্মবিসর্জ্জন যদি বীরত্বের পরিচায়ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে অত্যাচারীর অত্যাচার সহিয়া সহিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সুদীর্ঘ-কালের প্রযত্নে নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া যাইবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাও বীরত্বেরই সূচক, শৌর্য্যেরই উপচায়ক। সুতরাং তোমার উপরে নির্দ্দেশ হইল যে, আগামী শ্রাবণ মাসে পুনরায় যে সাত শত তালের বীজ পুপুন্‌কীর জন্য সংগ্রহ করিতে হইবে, এখনি ইহা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাইয়া দাও। তিনটী বীজ আমরা বারাণসী নিয়া গিয়াছিলাম কল্যাণীয়া মা-মণি সংহিতাকে ফোঁপড়া খাওয়াইব বলিয়া। এবারকার ব্যাপারে আমাদের লাভের অঙ্ক ঐ তিনটী ফোঁপড়া মাত্র।

তোমরা অনেকেই ১লা জানুয়ারী মালটিভারসিটির দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষ্যে আসিতে চাহ। তোমরা যখন ত্রিপালের এমন ঢালাও ব্যবস্থা করিতেছ, তখন তোমাদের কাহাকেও আমি আর আসিতে নিষেধ করিব না। অনেক ক্লেশ ও অসুবিধা এখানে হইবে, তাহা হাসিমুখে সহ্য করিয়া নিবার রুচি ও মনোবৃত্তি নিয়া প্রত্যেকে আসিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৬ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পতি, পুত্র, কন্যাদি প্রভৃতি পরিজনকে সমভাবে ভাবিত কর। মানুষ মাত্রেরই জন্ম পরহিতার্থে, মানুষ মাত্রেরই জীবনকর্ম্ম পরহিতার্থে পরিচালিত হওয়া উচিত। সেই দিকে লক্ষ্য দিয়া চলিও।

যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, তার মতন সুখীই বা কে, নিশ্চিন্তই বা কে? তোমরা নিজ নিজ স্বভাবের অনুকূল ভাবে সর্ব্বকল্যাণের পরম-উৎস শ্রীভগবানের আশ্রিত হও।

স্বামী ও স্ত্রীতে সংযত জীবন যাপন করিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। ব্রহ্মচর্য্য যে যতটুকু পার, পালন কর, কিন্তু বাহিরে সেই কথা প্রচার করিয়া অনুশীলনকে কদাচ ভাণে পরিণত করিও না। সব ব্যাপারের বিজ্ঞাপন চলে, চলে না কেবল ব্রহ্মচর্য্যের। যে যতটুকু সংযম পালন করিবে, সে ততটুকু শক্তি অর্জ্জন করিবে। শক্তি মানে মূলধন। কোনও পরমধনবান্ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিও কি কখনো বাহিরের কাহাকেও তাহার সঞ্চিত ধনের পরিমাণ জানিতে দেয়? প্রকৃত সঞ্চয়ী ব্যক্তি নিজ সঞ্চিত সম্পদের কথা খোলা বাজারে প্রচার করিয়া বেড়ায় না। জীবনকে সংযমে সুন্দর কর, শুচিতায় অভিষিক্ত কর কিন্তু তাহা নিয়া বিজ্ঞাপন ছড়াইও না।

বহু ব্যক্তি যখন একই ভাবে ভাবিত হইয়া একই রকমের সদনুশীলনে ব্রতী হয়, তখন, তাহাদের নিজেদের মধ্যে কোনও পরিচয়ের সূত্র না থাকিলেও দূর হইতে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং ইহার ফলে ভাব-জগতে যে বিপুল তরঙ্গোৎক্ষেপ সুরু হয়, তাহা বিপ্লবের সৃষ্টি করে। "জন্মশাসন কর" বলিয়া যাহারা কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিরোধের নানা যান্ত্রিক কৌশল প্রচার করিতেছে, তাহাদের নিজেদের জীবনে সংযমের কোনও অভ্যাস, অনুশীলন, সাধন বা প্রযত্ন

এমনকি রুচি পর্য্যন্ত না থাকায় তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না যে, সংযম কত সহজ, কত স্বাভাবিক ও কত প্রীতিপ্রদ। সংযম-সাধকের পক্ষে প্রথম প্রথম রিপুর তাড়না বড়ই উদ্দাম হইয়া দেখা দেয় কিন্তু কিছুকাল ধৈর্য্য ধারণের পরে সব শান্ত হইয়া যায়। মাঝে মাঝে সুপ্ত দৈত্য হঠাৎ জাগিয়া উঠিবার চেষ্টা করে কিন্তু সামান্য প্রয়াসেই সে বশ মানে এবং তৎপরে যাবজ্জীবন প্রকৃত মানুষটীর ভৃত্যরূপে অবস্থান করে। সে তারপর হইতে কেবল শক্তি যোগায়, শক্তি হরণ করে না।

জলে নুন মিশাইলে তাহা নোন্‌তা হয়, চিনি মিশাইলে তাহা মিষ্টি হয়, লঙ্কা-বাটা মিশাইলে তাহা ঝাল হয়, হরীতকীচূর্ণ মিশাইলে তাহা কষায় হয়, কালমেঘের রস মিশাইলে তাহা তিক্ত হয়, ইহা যেমন বাস্তব সত্য, ইন্দ্রিয়-লিপ্সা দমন সম্পর্কিত উপরে লিখিত বিষয়গুলি তেমনই বাস্তব সত্য এবং অক্ষরে অক্ষরে সত্য। একথা যে জানিয়াছে, সে নির্ভয় হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৬ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * *

২

ধ্রুবং প্রেম্না

দম্পতীর ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমকে গভীর করিবার জন্যও সংযম আবশ্যক। অপরিমিত অসংযম বা অনিয়মিত ইন্দ্রিয়-চর্চ্চা উভয়ের অন্তরের সম্পর্ককে অগভীর করিয়া দেয়।

সংযম-পালন যে বিবাহিত জীবনে কি মধুস্বাদের সৃষ্টি করে, তাহা যখন নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ, তখন ইহার গুণ-ব্যাখ্যা করিয়া তোমাদের দুজনকে আমার আর কিছুই বলিবার রহিল না। নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ব্রত-পালন করিয়া যাও। তোমার মতন আরও বহু জন আমাকে বলিয়াছে,—"হায়, এতদিন কি নরকে ডুবিয়া ছিলাম, আজ কি স্বর্গীয় আনন্দ অন্তরে খেলিতেছে।" অতীব সঙ্গোপনে ব্রতপালন করিয়া যাও। নিজেদের মরম-কথা নিজেদের মরমেই রুদ্ধ রাখিয়া, বাহিরের কাহাকেও ছন্দাংশ মাত্রও জানিতে না দিয়া এই ব্রতের অনুশীলন করিতে হয়। তোমরা যে একদা এই মহাব্রত নিজেদের জীবনে পালন করিয়াছিলে, তাহার প্রমাণ সমগ্র জাতির সুপ্রসারিত বহুযুগে তিনশত বৎসর পরে প্রকটিত হইবে। তোমাদের শুভ-সাধনার ফল জগতের বুকে এখনি ফুটিয়া উঠিতে দেখিবার জন্য কণামাত্রও ব্যগ্র হইও না। তোমরা তোমাদের ব্রতের জন্য মান চাহিও না, যশ চাহিও না, প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশা করিও না, প্রশংসার জন্য লুব্ধতা অনুভব করিও না। আমি দেশ, জাতি ও জগৎকে যাহা দিতে চাহিতেছি, তাহা সাচ্চা সোণা, ইহার মধ্যে ভেজালবাজি বা মেকিদারী নাই। এই জন্যই তোমাদিগকে সংযম-সাধনা গোপনে করিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ দম্পতী যখন গোপনে সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইবে, তখন এক অভাবনীয় ঘটনার মুখে সমগ্র

পৃথিবী বিস্ময়ের সহিত তোমাদের পরিচয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৬ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইয়াছি। সত্যই ভারতে এক মহানিশা নামিয়াছে। এই নিশার অবসান ঘটিবে যদি নরনারী অধিকাংশে সৎ, সরল, নির্লোভ, ইন্দ্রিয়-সংযমরত ও পরামিষ্ট-বর্জ্জনকারী হইয়া একত্র হয়। কতকগুলি রিপুর দাস নরপশু মিলিত হইলেই তাহার ফলে নিষ্কৃতি আসে না। তোমরা প্রতি জনে সৎ হও, সাধু হও, পাপাচার-বিমুক্ত হও, সর্ব্বজীবে প্রেমানুশীলনে রত হও। ইহাই নিষ্কৃতির পন্থা। অনেকে অন্য রূপ নানা পন্থার বার্ত্তা বলিবেন। কিন্তু সেই সকল কথায় কর্ণপাত করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৭ই পৌষ, রবিবার, ১৩৮০

পরমকল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জনে জনে আলাদা পত্র দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অধুনা স্বাস্থ্যের ভাল অবস্থায় আমি প্রতিমাসে তিন হাজারের উপর পত্র লিখিয়া থাকি। ইহার ডাক-ব্যয়টা চিন্তা কর। ইহার পরিশ্রমের কথা ভাবিয়া দেখ। তোমাদের একজনের নিকটে লিখিত আমার একখানা পত্র লইয়া প্রত্যেকের নিকট তোমাদের যাওয়া উচিত।

তোমরা প্রত্যেকে যে যতটুকু পার, ইন্দ্রিয়-সংযমের চেষ্টা কর, কেননা ইহার দ্বারা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। শক্তিহীনদের চেষ্টা নিষ্ফল হয়। সকলের মধ্যে ঐক্য-প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী হও। যে সাধন আমার নিকটে পাইয়াছ, তাহা জগতের শ্রেষ্ঠ সাধন। এই পরমোৎকৃষ্ট মহামন্ত্রের সাধন৷ করিয়া তোমরা জগজ্জয়ী হইবার আয়োজন কর। মানুষের উপরে অন্যায় প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য নহে, মানুষকে জীবনযাত্রার শ্রেষ্ঠ পন্থা প্রদর্শনের জন্য তোমাদের এই জয়যাত্রা। প্রতিটি মানুষকে তাহার স্বাভাবিক প্রতিভার ভিত্তির উপরে দাঁড়াইয়া বিশ্বকে প্রেম-ভরে আলিঙ্গন করিবার শিক্ষা দানের জন্য এই অভিযান। ধর্ম্মের নামে নূতন বিভীষিকা বা দুর্ভেদ্য কুহেলী সৃষ্টি তোমাদের লক্ষ্য নয়।

তোমাদের প্রত্যেককে এখন অখণ্ড আদর্শের প্রচার কাজে নামিয়া যাইতে হইবে। ধনি-দরিদ্র, জ্ঞানি-মূর্খ, ছোটবড়, স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেককে কাজে লাগাও। কেহ বসিয়া থাকিও না। চারিদিকের প্রতিটি পাড়ায়, প্রতিটি পল্লীতে প্রবেশ কর। সকলকে তোমাদের আদর্শবাদের সহিত পরিচিত করাও। ধীরে ধীরে দেখিবে যে তোমাদের বহু অজানা ব্যক্তি তোমাদের সংঘকে শক্তিশালী করিবার জন্য ছুটিয়া আসিবে। তোমাদের এখন সাধন-বল সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাবলেও

বলীয়ান হইতে হইবে। অর্থাৎ সজ্জনদের দ্বারা সংঘপুষ্টি করিতে হইবে। অসৎ লোকের দ্বারা সংঘের পুষ্টিসাধন হইলে সেই সংঘ অচিরে বিনাশ পায়।

তোমরা প্রত্যেকে এক একজন স্থানীয় সংগঠক হও। তোমাদের প্রত্যেকের আচরণ এমন সুন্দর হউক যেন সমগ্র পৃথিবী মুগ্ধ নয়নে তোমাদের দিকে তাকায়। তোমরা যত পবিত্র হইবে, তোমাদের প্রচার-কর্ম্মও তত সার্থক হইবে। যে যত পবিত্র, সে তত সুন্দর। যে যত সুন্দর, সে তত আকর্ষণীয়। যাহার ভিতরে চৌম্বক শক্তি সঞ্জাত হইয়াছে, আকর্ষণ একমাত্র সে-ই করিতে পারে। কোমরে দড়ি বাঁধিয়া টানিলেই আকর্ষণের কাজ হয় না, প্রাণকে ছিনাইয়া আনিয়া নিজের হিয়ায় বাঁধিয়া নেওয়াই প্রকৃত আকর্ষণ। সৌন্দর্য্যের এই শক্তি আছে। তোমরা সাধন করিয়া যথার্থ সুন্দর হও।

লক্ষ্যটি স্থির রাখিও যে "অখণ্ড" এই নূতন শব্দটিকে তোমরা জগতে এক অসামান্য কৌলীন্য দিয়া যাইবে। কোনও "অখণ্ড" মিথ্যা কথা কহিবে না। কোনও "অখণ্ড" ছল-প্রবঞ্চনায় যাইবে না। কোনও "অখণ্ড" পরনিন্দায় রত হইবে না। কোনও "অখণ্ড" ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোককে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখিবে না। কোনও "অখণ্ড" আলস্যে কাল-হরণ করিবে না। প্রত্যেক "অখণ্ডকে" জগতের মঙ্গলকল্পে কর্ম্ম এবং সাধনা করিয়া যাইতে হইবে।

এই কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া তোমরা চতুর্দ্দিকে নূতন "অখণ্ডের" সংখ্যা-বৃদ্ধিতে লাগিয়া যাও। সাধনে অরুচি সম্পন্ন এবং লোকের সহিত প্রবঞ্চনারত কতকগুলি দুষ্ট ও অশিষ্ট লোকের দ্বারা যাহাতে অখণ্ডদের সংখ্যা-বৃদ্ধি না ঘটে, ইহা তোমাদিগকে দেখিতে হইবে। অন্যান্য

সংঘ প্রচলিত যেই ধারায় মানুষকে আকর্ষণ করে, তোমাদের কর্মধারা কদাচ তাহা হইবে না। মিথ্যা অলৌকিক কাহিনী এবং অন্যান্য বিভূতির নানা রসন্যাস রচনা করিয়া সংঘপুষ্টির যে দূষিত দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে দেখিতে পাইতেছ, তাহার অনুকরণ বা অনুসরণ তোমরা করিও না। কাহাকেও ভয় দেখাইয়া, প্রলোভনে ফেলিয়া তোমরা তোমাদের সজ্যের প্রতি আকৃষ্ট করিও না। ভয়, লোভ, অন্যায় আশ্বাস দিয়া যত জনে নিজ সজ্ঘ পুষ্ট করিয়াছে, তাহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে চোর, শঠ, প্রবঞ্চক ও দস্যুদের জন্মদান করিয়া ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে।

ব্যক্তিজীবনের পরম লক্ষ্য আর সংঘজীবনের প্রারম্ভিক ও পরিণাম-লক্ষ্য যখন এক ও অভেদ, তখনই কাহারও সজ্যপ্রবেশ সার্থক হয়। সংঘের লক্ষ্য আর জাতীয় জীবনের লক্ষ্য যখন পরস্পর পরিপূরক এবং অবিরোধী হয়, তখনই সংঘ প্রকৃত সৎ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলা চলে। জাতীয়তা এবং বিশ্বজনীনতা যখন কানাই-বলাই এর মত গলাগলি করিয়া চলে, একটী অপরটীর হন্তারক বা বিঘাতক হয় না, তখনই জাতীয়তা-বোধ প্রকৃত মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়। বিশ্বজনীনতা যখন ব্যষ্টির ক্ষুদ্র জীবনের প্রতিটি চিন্তাকে রক্ষিত করে এবং ব্যক্তির দেহ-মনের প্রতি পরমাণুতে আর প্রতি পরতে জীবিত ব্যক্তির রক্ত-স্রোতের ন্যায় নিয়ত সঞ্চরণ করে, তখনই ব্যক্তি নবজন্ম পাইয়া সার্থক হইয়াছে বলা চলে।

তোমাদের চিন্ত-ভাবনা এইরূপ হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৯ই পৌষ, মঙ্গলবার, ১৩৮০
(২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সম্মুখে ১লা জানুয়ারী, মালটিভারসিটির উদ্বোধনের দিন। সুতরাং আজ ২৫শে ডিসেম্বর যে জন্মদিনের অনুষ্ঠানে আড়ম্বর এক কণাও থাকিবে না, ইহা সহজেই অনুমান করিতে পার। কিন্তু অনেকে তাহা ভাবে নাই। উপাসনায় আসিয়া অনাড়ম্বর ব্যবস্থা দেখিয়া কেহ কেহ মনে বেশ দুঃখ পাইয়াছে। কিন্তু আমার জন্মটা হইল আসলে কবে?

শরীর ভূমিষ্ঠ হইল কোনও এক খ্রীষ্টমাসের দুই একদিন আগে বা পরে বা ঠিক সেই দিবসেই এক মঙ্গলবারে। সন তারিখ কাহারও মনে নাই, মনে আছে শুধু মঙ্গলবারটুকুই। এজন্য এখন যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিনের কাছাকাছি এক মঙ্গলবারে জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়। সুতরাং কোষ্ঠি-ঠিকুজীর গণনা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন এবং নিষ্ফল। অতএব কোন্ গ্রহের কোপে কখন আমার কি বিপদ ঘটিবে, তদ্বিষয়ে আমি একেবারে নিরুদ্বেগ। কোনও গ্রহের সন্তোষ সাধনের দ্বারা নিজের পথের কোনও কণ্টকোদ্ধার-চেষ্টাও আমার কল্পনার বাহিরে। অনেকেরই ত জন্মদিনের উৎসবের কথা পত্রিকায় পত্রিকায় লিখিত হয়। আমার জন্মদিনের তারিখ এই জন্যই পঞ্জিকাকারদের ঠিক করিবার উপায় নাই, প্রয়োজনও নাই। প্রয়োজন নাই তাঁহাদের ইহা যতটুকু সত্য, প্রয়োজন নাই আমার, ইহা তার চেয়ে শতগুণ বেশী সত্য।

মুসলমানদের যেমন মাসের হিসাব চাঁদকে দিয়া, নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের জন্মদিনের হিসাব যেমন তিথি-নক্ষত্র দিয়া, ভারতীয় রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতাদের জন্মদিন যেমন ইংরাজি মাসের ইংরাজি তারিখ দিয়া, আমার তেমন জন্মদিনের হিসাব মঙ্গলবারকে দিয়া। এই একটু বিচিত্রতার জন্য ধন্যবাদ দিতে পারি শুধু তাঁহাদের, যাহারা মঙ্গলবার নামে একটা নির্দ্দিষ্ট বারের নামকরণ করিয়াছিলেন।

আমার মতন অসংখ্য মানুষ অসংখ্যবার অসংখ্য পরিবারে অসংখ্য পরিবেশে অসংখ্য কর্ম্ম ও অকর্ম্ম নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং কালতরঙ্গের বিক্ষোভে পড়িয়া চিরতরে বিস্মৃতও হইয়াছে। হয়ত তাহাদেরও প্রতিজনের জন্মদিনকে সম্মান করিবার জন্য কত হইয়াছে উৎসবায়োজন এবং সমারোহ, কিন্তু তাহাতে জগতের কি গেল আর আসিল? আমার জন্মদিনের উৎসবও কত স্থানে তোমরা কত ঘটা করিয়া করিয়া থাক বা করিতেছ, তাহাতেই বা জগতের কি আসে আর যায়? আমি আমাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া জ্ঞান করি। সাধারণের সম্পর্কে তোমরা যাহা কর বা ভাব, আমার সম্পর্কে তোমরা তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করিলে আমার মনে হয় যেন আমাকে আমার প্রাপ্যের অধিক তোমরা দিলে। যেখানে জগতের একটি প্রাণীর প্রতি তোমাদের প্রদেয়ের অন্ত নাই, অথচ প্রায় কাহাকেও বিশেষ কিছু দিতেছ না, সেই ক্ষেত্রে আমাকে আমার প্রাপ্যাতিরিক্ত স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান বা প্রতিপত্তি দান করিলে তাহা তোমাদের দিকে হয় অবিচার আর আমার দিকে হয় অকারণ ঋণবৃদ্ধি, দায়বৃদ্ধি ও ভারবৃদ্ধি।

যে-কাহারই হউক, জন্মোৎসব একটা আনন্দ-বর্দ্ধক ব্যাপার। তোমরা এই একটা উপলক্ষ্য নিয়া আনন্দ করিতে চাহ, আমি তাহাতে বাধা দিয়া তোমাদের মনে ক্লেশোৎপাদন করিব না। কিন্তু আমি চাহিব যে, আমার জন্মদিনে তোমরা জগতের কোটি কোটি আগত, বিগত ও অনাগত প্রতিটী প্রাণীর জন্মকে এভাবে অন্তর দিয়া অভিনন্দিত করিও। ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ পৌষ, বুধবার, ১৩৮০
(২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা— ও মা—, তোমরা উভয়ে আমার প্রাণভরা সান্ত্বনা জানিও। একটা লোকের মৃত্যু হইয়া গেলে পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিতান্ত নিষ্করুণ যুগেও দুচার জন হৃদয়বান্ ব্যক্তি ছুটিয়া আসিয়া কাছে বসে, নীরবে বসিয়া কান্না শোনে, মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বা বিগলিত অশ্রু বর্ষণ করিয়া শোক-প্রতপ্তের জ্বালা কমাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে বিপদে তোমরা আজ পড়িয়াছ, এই বিপদে এমন ব্যক্তি অল্পই পাইবে। তোমার কন্যা পরের ঘরের ছেলের সঙ্গে না বলিয়া

না কহিয়া পলাইয়া গেল, এবং হয়ত গোপনে জওহরলালের আশীর্ব্বাদ-পূত রেজিষ্ট্রী-ম্যারেজ করিয়া কৃতার্থ হইল, হয়ত বা কালীঘাটে গিয়া মালাবদল করিয়াই নিশ্চিন্ত হইল, হয়ত বা এসব সামাজিক বালাই পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া একেবারে বল্গাহীন অশ্বে চাপিয়া বসিল, এমন অবস্থায় তোমাদের মনের ব্যথার গভীরতার দিকে তাকাইয়া কোন্ হিতৈষী আসিয়া তোমাদের পাশে বসিবে এবং বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিবে, ইহা ত জগৎ জুড়িয়াই হইতেছে, তবে আর দুঃখ কর কেন? হয়ত কেহই আসিবে না, হয়ত কেহই পাশে বসিবে না, হয়ত কেহই তোমাদের দুঃখের গভীরতা বুঝিবে না, হয়ত কেহই মনে প্রাণে তোমাদের সান্ত্বনা-লাভ চাহিবে না। তোমাদের এমন বিপদে আর কেহ তোমাদের সঙ্গে না থাকুক ত আমি আছি।

কন্যার অকৃতজ্ঞতায় মুসরিয়া পড়িও না। এই যুগে পুত্রকন্যাদের কাছে অকৃতজ্ঞতাই পিতামাতার প্রাপ্য। কারণ, পিতৃমাতৃভক্তি শিক্ষাদান এই যুগে ক্যারিকুলামের বা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই যুগের শিক্ষকেরা নিজেরাই হয়ত কেহ পিতৃমাতৃভক্ত নন। কি করিয়া তাঁহারা ছাত্র-ছাত্রীদিগকে পিতৃমাতৃভক্তি শিক্ষা দিবেন? বিদেশ হইতে বিজাতীয় ধ্যান-ধারণার আমদানী ত এই শিক্ষক মহাশয়েরাই সর্ব্বাগ্রে করিয়া যাইতেছেন। জন্মদান করিয়া বা গর্ভধারণ করিয়া পিতা ও মাতা সন্তানের কৃতজ্ঞতা কি করিয়া আশা করিবেন? তাঁহারা নিজেরা ত নিজ নিজ পিতামাতার প্রতি অধিকাংশেই ভক্তিমান্ বা ভক্তিমতী ছিলেন না। পিতামাতার পারস্পরিক বুঝাপড়ার ফলে একটা জৈব প্রক্রিয়া ঘটিল আর তারই ফলে সন্তান জন্মিয়া ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই পিতামাতার সেবার, যত্নের, ত্যাগের, উপার্জ্জনের, সুখের,

স্বাচ্ছন্দ্যের ভাগীদার ও দাবীদার হইল,—এজন্য পুত্র বা কন্যা মাতা-পিতার কাছে আবার কৃতজ্ঞ হইবে কেন? পিতা বা মাতা যদি পুত্রের সহিত এক ধর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হয়, এক পার্টির সভ্য হয়, তবেই তাহাদের প্রাণদণ্ড মকুব হইতে পারে, নতুবা স্থানবিশেষে এমন জনক-জননীকে শমন-সদনে প্রেরণ করিলে কোনও অন্যায় হয় না। ইহাই এই যুগের ন্যায় বিচার, ইহাই এই যুগের সজ্জন-সম্মত সুসিদ্ধান্ত।

তবে আর শোক করিবে কেন? মনকে শান্ত কর। অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন কর। এই সকল ঘটনা অতীতে কিছু কিছু ঘটিয়াছে, বর্ত্তমানে ঘটনার স্রোত প্রবলতর হইতেছে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা শুধু নদী-স্রোতই থাকিবে না, রূপ পরিগ্রহ করিবে সীমাহীন পারাবারের। তথাপি তোমাদের ক্ষমাই করিতে হইবে। সন্তান যতই অকৃতজ্ঞ হউক, তাহাকে ক্ষমা কর মা ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বাবা ক্ষমা কর। তোমাদের ক্ষমাসমর্থ শান্ত মনটীর ভিতরে আমার অন্তরের অফুরন্ত স্নেহ আস্বাদন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষা যখন আমার কাছেই নিয়াছ, অন্য সহস্র স্থানে দীক্ষা নিবার সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, এমনকি অনেকে তোমাদিগকে নিজ নিজ ঘাটে স্নান করাইবার জন্য কাছাকোছা গামছা ধরিয়া টানাটানি করিবার পরেও যখন তোমরা আমারই মন্দাকিনীর পুণ্য নীরে অবগাহন করিবার ব্রত নিয়াছ, তখন কতকগুলি কথা তোমাদিগকে বলিবার আমার প্রয়োজন আছে, অধিকার আছে, দায়িত্ব আছে। ইহা ত প্রত্যেকেরই জানা যে আমি তোমাদের একজনকেও ডাকিয়া আনিয়া এখানে মাথা নোয়াইতে বলি নাই। স্বেচ্ছায় আসিয়াছ, স্বেচ্ছায় দীক্ষাগৃহে দীর্ঘ প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছ, এবং দীক্ষাকালে যথোচিত গম্ভীরতা সহকারে প্রতিটি বাক্য শুনিয়াছ এবং প্রতিটি প্রতিশ্রুতি দিয়াছ। এখন যদি তোমরা সাধন-কর্ম্মে বসিবার সময়েই এক নিদারুণ অনিচ্ছা বা অরুচি অনুভব কর, তবে তাহা ত বড়ই আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার হইবে! কেহ কেহ ত দীক্ষা অনেক বছর আগে নিয়াছ অথচ সাধকজনোচিত বহু স্বাভাবিক সদ্‌গুণের বিকাশ তোমাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হইতেছে না। সুতরাং বুঝিতে ক্লেশ হয় না যে, তোমরা অনেকেই দীক্ষা নিয়া যেন বিপদে পড়িয়াছ। দীক্ষাটা না নিলেই যেন ভাল হইত। কেননা, দীক্ষা যে নেয় নাই, তাহার ত সাধন-কর্ম্মে কিছু সময় বিনিয়োগ করা একান্তই বাধ্যকর নহে। কিন্তু দীক্ষা যখন ভাবিয়া চিন্তিয়াই নিয়াছ, তখন একথা বলিলে আমি তাহা অক্লেশে মানিয়া নিতে পারি কি করিয়া?

জীবনের মঙ্গলময় এক পরমশুভ মুহূর্ত্তে সুধন্য অখণ্ড-মহামন্ত্রের দীক্ষা পাইয়াছ। ইহা যে মানব-জন্মের কত বড় সৌভাগ্য, তাহা বুঝিতে হইলে তোমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। অন্যান্য দিকের

বহির্মুখতা আংশিক ভাবে হইলেও হ্রাস করিয়া তোমাদিগকে গুরুদত্ত নামের সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথাটুকু কখনও বিস্মৃত হইও না।

অখণ্ড নাম তোমাকে নিয়ত পবিত্রতর এবং পুণ্যবান্ করিবে। নামের সেবা মনের সহস্র গ্লানি এবং দেহের অশেষ দুর্ব্বলতা দূর করিবে। নাম-সেবার মধ্য দিয়া তোমরা বল সংগ্রহ কর। নামের সেবাকে যশ আহরণের উপায় রূপে গ্রহণ করিও না। নামের সেবাকে বিশ্বের অবিমিশ্র হিতসাধনের উপায় জানিয়া তাহা অবলম্বন কর। নামের সেবাকে সততা, সম্প্রীতি, সরলতা ও সরসতা লাভের উপায় জানিয়া আশ্রয় কর। দার্শনিক মতামত যাহার যাহাই হউক, সামাজিক সমস্যার সমাধান যে যে ভাবে করাই প্রয়োজনীয় বোধ করুক, অর্থনৈতিক হট্টগোলে জান বাঁচাইবার চেষ্টা যাহার যেই পন্থানুযায়ীই হউক, নামের অকপট সেবা প্রত্যেককেই এমন এক সংগুপ্ত অমৃত-ধারার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগে যুক্ত করিয়া দিবে যে, যখন সমগ্র ধরিত্রী প্রচণ্ড দাবদাহে বা অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলিয়া পুড়িয়া হাহাকার করিতেছে, তখনও তোমার প্রাণে থাকিবে অনাবিল শান্তি ও অকৃত্রিম প্রেম। কর্ত্তব্যে কঠোর হইয়াও দুর্ব্বৃত্তের প্রতি প্রেমময় স্বভাব অটুট রাখিবার শক্তি নামসাধকেরই হয়, নীতিশাস্ত্রের তত্ত্বালোচনাকারীরও হয় না, পশুবলে ব্রহ্মাণ্ডবিজয়কারী দুর্দ্ধর্ষ শক্তিমান্ ধনুর্দ্ধরেরও হয় না। প্রতিটি মরুভূমাঝে কোটি কোটি কূপ আছে যত্নে লুক্কায়িত, নামের সেবক করে তাহারই সুশীতল বারি আস্বাদন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১০ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। কি সেই স্নেহ আর, কি সেই আশিস? আমি তোমাদিগকে ভালবাসি বলিয়াই তোমাদের প্রতি আমার মমত্ববোধজনিত আকর্ষণই কি আমার স্নেহ? আমি তোমাদিগকে ভালবাসি আর না বাসি, তথাপি তোমাদের সহিত আমি আমার আমিত্বে অভেদ। এই বোধ হইতে সঞ্জাত আমার যে কোমল মনোভঙ্গী, তাহাই আমার স্নেহ। তোমরা জগতে বড় হও, জয়ী হও, সুস্থ হও, সবল হও, সুপ্রতিষ্ঠ ও স্বপ্রতিষ্ঠ হও, মাত্র ইহাই কি আমার আশিস? তোমাদের জীবন সর্ব্বতোভাবে বিশ্ববাসীর কুশল সাধনের জন্য উৎসর্গীকৃত হউক, ইহাই আমার প্রকৃত আশিস। এই জন্যই ত তোমাকে সাধনদীক্ষা দিবার কালে আমি এত অকপট ও এত অকৃপণ হইতে পারিয়াছি। সবাই সবাকে নিজ নিজ মোক্ষসাধনের পন্থা বলিয়া দিবার জন্য যেই সময়ে ব্যস্ত, আমি সেই সময়ে প্রতিজনকে জগৎ জুড়িয়া প্রতিটী প্রাণীর কুশলের জন্য সাধন করিতে উৎসাহ দিতে, উদ্যম করিতে, ঔৎসুক্য জাগাইতে আগ্রহী। এই কারণেই তুমি অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পার যে, এযাবৎ যত প্রকারের সাধন-পন্থার প্রচার বা প্রবর্ত্তন পৃথিবীতে ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে তোমার সাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং এই জন্যই তোমার পক্ষে সাধনে-অমনোযোগী থাকা গুরুতর ক্ষতির ব্যাপার। তোমাদের জীবনে কর্ম্ম ও সাধনা যুগপৎ রূপরস্ত হইয়া ফুটিয়া উঠুক, আমি তাহাই চাহি। অন্যান্য

মতের সাধকদিগকে অবহেলা, গর্হণ, নিন্দা বা তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া নিজ নিজ সাধনে প্রত্যেকে বিশেষ ভাবে অবহিত হও। নিজ সাধন-পথকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছ বলিয়াই অন্যের সাধন-পন্থার প্রতি ভ্রূকুটি করিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। ভদ্র-সজ্জনেরা কদাচ তাহা করেন না। বুদ্ধিমানেরা এমন গর্হিত অধ্যবসায় হইতে বিরত হন। সুশীল সুধীর মানুষেরা পরের কথায় সময় নষ্ট করেন না। অন্য-মতাবলম্বীদের সংঘশক্তির স্ফূরণে ও ব্যবহারিক বিস্তার-সাধনে তাঁহারা ঈর্ষ্যান্বিতও হন না। কেহ শত্রুর মত বিরুদ্ধ অভিপ্রায় নিয়া স্কন্ধের উপরে আপতিত হইলে স্বকীয় আত্মরক্ষার অধিকার তাঁহারা নিশ্চয়ই প্রয়োগ করেন, কিন্তু কদাচ তাঁহারা বৃথা কলহে মত্ত হন না। দৈবাৎ কলহ বাঁধিয়া গেলে বিবাদ-পাশ-মুক্ত হইবার জন্য তাঁহারা দ্রুত চেষ্টিত হন এবং কোনও কলহ যাহাতে তাঁহাদের আত্মিক অবনতি ও নৈতিক অধোগতি না আনিতে পারে, তৎকল্পে বিশেষ ভাবে প্রয়াসী হন।

নিজেদের ভিতরে পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং সভতার অনুশীলন গভীর হইলে আকস্মিক কোনও সমস্যাই কদাপি তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। আমরা কেহ কেহ ভণ্ডামি করিতেছি বলিয়া দেশের নানা-সমস্যা-পীড়িত ক্লান্ত ও রুগ্ন মনগুলি সাধু-সজ্জন নামধারী ব্যক্তি মাত্রেরই প্রতি কিরূপ খড়্গহস্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই সংবাদপত্রগুলির প্রবন্ধে, নিবন্ধে, সংবাদে এবং সংবেদনে জানিতে পারিতেছ। এইরূপ উত্তপ্ত বাতাবরণেও প্রকৃত শান্তির পূজারীরা কণামাত্র অস্বস্তি বোধ করিতেছেন না। বিশ্বমানবের কুশলের জন্য সমগ্র মানবজাতির এক দিব্য উত্তরণের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে প্রশস্ততর করিবার জন্য, সত্য করিবার জন্য, তোমাদের সংঘবদ্ধ ভাবেও সত্যানুসরণ,

সত্যানুশীলন, সংযম পালন, অসভ্যতা বর্জন, সচ্চিন্তার প্রসার-সাধন এবং চিন্তাকে কর্মের ভিতর দিয়া রূপায়িত করিয়া সেই কর্মের প্রোজ্জ্বল আলোকে চিন্তাকে পরিশোধন করিয়া যুগ যুগ ব্যাপিয়া অক্লান্ত চরণে পথ চলিতে হইবে। আমার কাছে দীক্ষা নিয়াছ তোমরা সেই জন্য।

ইতি—

আশীর্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

মহলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১০ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। তোমার পত্র পাইয়াছি।

প্রত্যেকে যথাসাধ্য সংযমব্রত পালন করিবে, কারণ সংযম হইতে শক্তির উদ্ভব হয়। তোমাদের লক্ষ্য মহৎ ও বৃহৎ, তাহা লাভ করিতে হইলে বীর্য্যের প্রয়োজন, দুর্ব্বলের পক্ষে সুদূরবর্ত্তী এই লক্ষ্য কদাচ ভেদ করা সম্ভব নহে।

অলৌকিক ব্যাপারের প্রত্যাশায় দিন গুণিও না। লৌকিক ভাবেই লৌকিক জগতের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। মানুষের জন্ম এই এক হিসাবে অলৌকিক যে, কেন জন্ম হইল, আত্মা কোথা হইতে আসিল, প্রাণের কি করিয়া সঞ্চার হইল, কেন এমন আশ্চর্য্য এক শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া ভূমিষ্ঠ হওয়ার জটিল প্রক্রিয়াটি স্বাভাবিক ভাবে ঘটিয়া গেল, তাহার পশ্চাৎপর্ব্ব সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না বা আমাদের

কিছুই মনে নাই। কিন্তু আমার জন্মের জন্য পিতার প্রয়োজন হইয়াছে, মাতার আবশ্যকতা পড়িয়াছে, উভয়ের মধ্যে সহস্র প্রকারের মানসিক আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও শারীরিক ঐক্য স্থাপন অপরিহার্য্য হইয়াছে এবং পিতার পুষ্টি ও প্রতিভা, মাতার ধারণা শক্তি ও মনীষা, উভয়ই পরস্পর এক অত্যাশ্চর্য্য মিশ্রণের অধীন হইয়া আমার সদসদ্-গুণাবলির বিকাশে সহায়ক বা হন্তারক হইয়াছে, ইহা একেবারে দৈবিক সত্য বা ভৌমিক সত্য, এই সত্য সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। সুতরাং ইহাকে অলৌকিক বলিয়া ভাবিবারও বাধ্যবাধকতা নাই।

একদা অপূর্ণ এক জীব ক্রমশঃ জীবকোষের বিবর্ত্তন ঘটিতে ঘটিতে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হইল, ইহা এক লৌকিক ইতিহাস এবং তোমাদের মত মানুষেরা ধারাবাহিকতার ক্রম ধরিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে একদা এক দেবমানবজাতির সৃষ্টিকে সম্ভব করিবে, ইহাই এক লৌকিক সম্ভাব্যতা। সুতরাং অলৌকিকের উপর হইতে নজর তুলিয়া আনিয়া নিজেদের লৌকিক জীবনের পরিপূর্ণতা ও পরিচ্ছন্নতার দিকে তীক্ষ্ণতর দৃষ্টি দাও।

তুমি যে ঘটনাটির কথা লিখিয়াছ, তাহাকে ভৌমিক বা লৌকিক ব্যাপার বলিয়া মনে করা যায় না। কিন্তু ব্যাখ্যার অতীত এইরূপ ঘটনা অহরহই আমার জীবনে ঘটিয়াছে বলিলে হয়ত মিথ্যা বলা হইবে না। অথবা, এই সব ব্যাপারের প্রতি আমার কোনও কৌলীন্যবোধ নাই বলিয়া, এমন ব্যাপার আমার জীবনে ঘটে নাই বলিয়াও বলিতে পারি। তোমরা চমৎকৃত হইয়াছ, হয়ত হইবারই কথা। কিন্তু এসব প্রচার করিবার কাজে তোমরা নিজেদের অধ্যবসায়ের অপচয় করিও না। যাহা হাজার জনে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, তাহা অলীক বা ইন্দ্রজাল নাও

হইতে পারে। কিন্তু এই সব ঘটনার সহিত তোমার আত্মোৎকর্ষের সম্পর্ক কতটুকু বা কি, তাহা চিন্তা করিও।

আমি বলি, তুমি সংযমী হও, ইন্দ্রিয়ের উপরে কর্তৃত্ব-সম্পন্ন হও। ইহাতে জগতের যত লাভ, তোমার বাড়ীতে আমি সূক্ষ্ম শরীরে গিয়া যদি অনেক অলৌকিক কাণ্ড করিয়াও থাকি, তবে তাহাতে জগতের লাভ তার সহস্রাংশের একাংশও নহে। তোমাদের এক গুরুভাই আমাকে রাজস্থান যাইবার জন্য লিখিয়াছিল কিন্তু সে ইহাও লিখিয়াছিল যে, সেখানে গিয়া আমাকে কিছু চমৎকারিত্বও দেখাইতে হইবে। পত্রখানা পাইয়াই আমি মনে মনে স্থির করিলাম যে, অন্য যত দেশেই যাই, রাজস্থানে যাইবার কথা আর ভাবিব না। চিত্ত চমৎকার ম্যাজিক দেখাইবার জন্য যাদু-সম্রাট পি, সি, সরকারের জন্ম হইতে পারে, আমার জন্ম অত সাধারণ কাজের জন্য নয়। জন-সাধারণ সাধুদের মধ্যে ম্যাজিক দেখিতে চাহে বলিয়াই ত সাধু-নামধারীদের মধ্যে আবার বড় বড় প্রতারককে কখনো কখনো পুলিশের দেওয়া হাতকড়ি পরিতে হয়। অলৌকিক ব্যাপারকে প্রশংসাও করিও না, অলৌকিক ব্যাপারকে প্রত্যাশাও করিও না। তথাপি যদি অলৌকিক কিছু সত্য সত্য ঘটিয়া যায়, তবে তাহাকে ধীর প্রশান্ত, স্বস্তিপূর্ণ সবল মনে গ্রহণ করিও। বিচলিতও হইও না, উহা প্রচারও করিতে যাইও না।

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুঁপুন্‌কী আশ্রম
২০শে পৌষ, শনিবার, ১৩৮০
(৫-১-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—; তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। পত্রখানার নকল নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক পল্লীতে প্রেরণ কর, অথবা নিজে গিয়া সকলকে সমবেত করাইয়া পাঠ করিয়া প্রত্যেককে শুনাও। আমার কাজের ছোট ছোট ভারও যদি তোমরা নিতে না পার বা নিতে ইচ্ছুক না হও, তাহা হইলে ভাবিতে হইবে যে তোমরা অকৃতজ্ঞ এবং অভাজন। আমি কি তোমাদের নিকটে মান, যশ, পূজা, প্রণাম, অর্থ, সম্পত্তি বা অন্য কোনও প্রকার স্বার্থ এই জীবনে কদাপি চাহিয়াছি? আমি যদি তোমাদের দ্বারা দেশ, জাতি, সমাজ এবং জগতের কিছু সাত্ত্বিকী সেবা চাহি, তবে কেন তোমরা তাহাতে কৃপণ বা কুণ্ঠিত থাকিবে?

অখণ্ডমণ্ডলী গঠিত না হইয়া থাকিলে, যেখানে মাত্র দুই জন অখণ্ডও আছে, সেখানে অবিলম্বে তোমরা মণ্ডলী স্থাপিত কর। মণ্ডলীকে গুরু-বিগ্রহ জ্ঞান করিয়া সকলে মণ্ডলীর নির্দ্দেশ-ক্রমে চলিতে অভ্যাস কর। মণ্ডলী তোমাদের সকলের সহজ ভাবে, সরল ভাবে, উদার প্রাণে মিলিত হইবার স্থান। এই স্থানকে তোমরা কদাচ দ্বন্দ্ব, কলহ, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা কলুষিত করিবে না, এই প্রতিজ্ঞা কর। নিজেদের স্থানীয় মণ্ডলীকে শক্তিশালী করিয়া গড়িয়া তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তিতম পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে আর একটী মণ্ডলীর সগৌরবে

মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার কাজে সহায়তা কর। প্রতিটি মণ্ডলীকে অপরাপর মণ্ডলীর সহিত সখ্য, সহযোগিতা ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ কর। তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে মনোভঙ্গ ও যতিভঙ্গ করাকে তোমরা গুরুদ্রোহ জ্ঞান করিয়া সযত্নে পরিহার করিয়া চল। মণ্ডলী ব্যক্তি-বিশেষের নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠার স্থান নহে, মণ্ডলী প্রথমে তোমাদের অন্তরের সেবক ভাবকে অনুশীলিত করিবার বিদ্যালয়, দ্বিতীয়তঃ ছোটবড় সকলের স্বাভাবিক প্রতিভাকে বিপুলায়তনে প্রকাশিত হইতে দিবার পুণ্য-তীর্থ। চতুর্দ্দিকে পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে কত অসংখ্য নরনারী আছে, যাহারা যথার্থ আদর্শের সন্ধান না পাইয়া নিতান্তই সাধারণ জীবন যাপন করিতেছে। তোমরা তাহাদের প্রতি জনের নিকটে যাইয়া এই বাণী পরিবেশন কর যে, প্রত্যেক মানুষের অসাধারণ হইবার অধিকার আছে, প্রয়োজন আছে, পথ আছে। প্রতিটি মানুষের কাছে যাইয়া তোমরা অখণ্ড-আদর্শ প্রচার কর। প্রচার কর যে, জীবে জীবে এক শাশ্বত প্রীতির সম্বন্ধই প্রকৃত সত্য। প্রচার কর যে, কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা ইষ্ট লাভই পরম প্রাপ্য নহে, জগতের প্রতিটি প্রাণীকে সেই প্রাপ্তির, সেই লাভের অংশ দিতে হইবে। তোমরা চুম্বকের মত এক অপরাজেয় আকর্ষণে সকলে একত্রীভূত হও এবং বিদ্যুদগতিতে সঙ্ঘশক্তিকে জগৎকল্যাণে পরিচালিত কর। তোমাদের প্রতি গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীকে কাজে ডাক। কাহাকেও অবহেলা করিয়া বাদ দিও না, কাহারও উপরে বিদ্বেষবশতঃ তাহার কর্ম্মশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহারে বাধা দিও না, কাহাকেও দিও না অচেতন বা অবসাদ-গ্রস্ত মূঢ়ের মত নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিতে। কাল করিব, পরশু করিব, বলিয়া বলিয়া কেহ সময় নষ্ট করিও না। যাহা করিবার, তোমাদের

আজই করা চাই। আগামীকালের জন্য কাজ ফেলিয়া রাখিবে কেন? ভবিষ্যতের জন্য কাজ জমাইয়া রাখে কর্ম্মকুণ্ঠ অলসেরা। কিন্তু জগতে তাহারা কে কবে কোন্ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে?

বহুবার এক কথা বলিয়াছি। তবু শতবার বলিব, সহস্র বার বলিব, লক্ষ বার বলিব, কোটি বার বলিব। বলিব অনন্ত কাল ব্যাপিয়া। বলিব, তোমরা অলস থাকিও না, কাজে লাগ। বলিব, কেবল তোমার নিজের জন্য নহে, বিশ্ববাসী সকলের কুশলের জন্য তোমার জীবন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২২ পৌষ, সোমবার, ১৩৮০
(৭-১-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

য়ানিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রের দুয়ার ত খুলিলাম, উৎসব খুবই জমিল, বক্তৃতাগুলিও চমৎকার হইয়াছে। কিন্তু আমি তোমাদের নাড়ীর স্পন্দন যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমাকে আগের চেয়ে অধিকতর চিন্তিত হইতে হইয়াছে। তোমরা কেবলই আমার উপরে চাপ সৃষ্টি করিতেছিলে, য়ানিভার্সিটি খুলিতে আর দেরী কেন বলিয়া। এখন তোমরা যে নিশ্চিন্ত মনে পশ্চাদপসরণ করিবে, এবার আমি তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছি। য়ানিভার্সিটির জন্য আর কোনও হুজুগ

বা সুযোগ তোমাদের দ্বারা সৃষ্ট হইবার আশা অনেকটা মরীচিকা। সুতরাং তোমাদের হাতে অন্য কাজ তুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি।

তোমরা কি আমার জীবনী জান? জান না। এই জন্য জান না যে, আমি আমার জীবনের কোনও রোমাঞ্চকর অধ্যায়েরই যবনিকা তোমাদের কাছে অপসারিত করিয়া সব-কিছু জানিতে দেই নাই। দেই নাই এই কারণে যে, আমি অবিশ্বাস্য সত্য ঘটনাকে কাহিনীর পর্য্যায়ে নিয়া সমালোচিত হইতে দিতে চাহি না। দেই নাই এই জন্য যে, আমার নিজের বাহাদুরী জাহির করিতে গিয়া অন্য বহু বহু স্বনামধন্য পুরুষের স্বগুণে অর্জ্জিত বিপুল যশের মধ্যে বৃথা কলঙ্কের আরোপ কদাচ সুজনতা নহে। অনেক বড় বড় লোকের সান্নিধ্যে আমি অতি কচি কাঁচা বয়স হইতেই আসিয়াছি এবং আমার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক গোঁয়ার্তুমির জন্যই তাঁহাদের সঙ্গে সম্পর্কের মধুরতা বজায় থাকে নাই। আমি এক এক দিক্‌পালের প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ দেখিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক্‌পালের আকস্মিক পতন দেখিয়া হতভম্বও হইয়াছি। আমি মহান্ দাতার ঔদার্য্যের পাশাপাশি দাতৃজনদুর্ল্লভ কৌশল, দাম্ভিকতা এবং ষড়যন্ত্র-পরায়ণতা দেখিয়াছি এবং ধনের লোভ বর্জ্জন করিয়া নিজের অভিক্ষা-ব্রতে শক্ত হইয়া লাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু ঘটনাগুলি কাহারও কাছে কদাপি প্রকাশ করি নাই বা করিব না। কেননা, মান্য ব্যক্তির দুর্ণাম হইবে। অমনিতেই আমি অহঙ্কারী, তাহার উপরে আবার জীবন-কাহিনী বলিবার দুর্নিবার তাড়নায় যদি অহঙ্কার আরও বাড়িয়া যায়, তবে নিরুপায় হইব ভাবিয়াও কাহাকেও জীবন-কাহিনী বলি না। কিন্তু ইহাতে তোমাদের ক্ষতি

হইয়াছে। তোমরা কিছুই জান না বা বোঝ না বা বুঝিবার চেষ্টা কর না যে, যুগের প্রয়োজনের পটভূমিকায়, দেশের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে আমি তোমাদের কে এবং আমি কি।

কিন্তু এই কথাটুকু কি তোমরা এখনো বুঝিতে পার নাই যে, আমি এতকাল প্রায় একা একাই ত কাজ করিয়া আসিতেছি, কৈ তোমাদের ত করস্পর্শ আমার কর্ম্মায়োজন পাইতে পারিল না! এখন তোমাদের সকলকে সে কাজে হাত লাগাইতে হইবে। আমার দুইটী বাহু এবং একটী কণ্ঠ এতকাল যে শ্রম দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের ক্লান্ত হইবার কথা। কিন্তু তাহারা ক্লান্ত হয় নাই, অথচ গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে আর তোমরা চুপ করিয়া নিজ নিজ ঘরে জড়পিণ্ডের মতন বসিয়া আছ। এখন তোমাদিগকে সহস্র বাহু হইয়া, সহস্র কণ্ঠ হইয়া আমার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। সব না জানিলেও কিছুটাও কি জান নাই যে, এতকাল আমি প্রধানতঃ কি কি কাজ করিয়াছি, কি কি কথা বলিয়াছি, কি কি চিন্তা করিয়াছি? জীবন ভরিয়া আমি যাহাই করিতেছি, বিশ্বজনের কুশলের দিকে তাকাইয়াই ত করিতেছি। আমার নিজের দিকে তাকাইয়া কোন্ কাজটা কবে করিয়াছি, তাহা আমাকে কেহ বলিতে পারিবে? জগজ্জনের হিতকর্ম্মে আজ তোমাদিগকেই ত ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে অকুণ্ঠিত চিত্তে, নির্ভয় অন্তরে। চারিদিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানব-মানবী রহিয়াছে, যাহারা জীবনে কোনও প্রকৃত আদর্শের ডাক পাইল না বলিয়া বৃথাই জীবন-ভার বহিয়া মরিতেছে। আদর্শের বাণী লইয়া তোমরা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ কর। তোমাদের হস্ত, তোমাদের কণ্ঠ, তোমাদের জীবন তাহাদের সেবায় সার্থক হউক। তোমাদের

আন্তরিক সেবা তাহাদিগকে প্রকৃষ্টতম জীবন-গঠন-পন্থায় টানিয়া আসুক। এই কাজে তোমরা তোমাদের প্রতিটি ভ্রাতা ও ভগিনীকে ডাকিয়া আনিয়া নিয়োজিত কর।

মালটিভারসিটির দ্বারোদ্‌ঘাটনের পর হইতে উপরি-উক্ত চিন্তাগুলি আমাকে পীড়া দিতেছে। তোমরা কি অলস হইয়া বসিয়া থাকিয়া সর্ব্বপ্রকার সদনুশীলনে নিজেদের অক্ষমতা প্রমাণিত করিয়া জগতে শুধু অবিমিশ্র ধিক্কার সংগ্রহ করিবে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২২শে পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এতদিন ব্যস্ত ছিলাম মালটিভারসিটির নির্ম্মাণ-কার্য্য নিয়া, বিগত পঁয়তাল্লিশ বৎসর এই বিষয়ে আমার ফুরসুৎ ছিল না। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নির্ম্মাণ-কার্য্যগুলি এখনো হইতে পারে নাই, ছাত্রাবাসের নিম্নতলে ছাদ নাই। তথাপি তোমাদের মত সহস্র জনের অবিরাম তাগাদায় একান্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় মালটিভারসিটি ষ্টার্ট করিয়া দিলাম।

এখন একদিকে যাট-পঁয়ষটিটি ছাত্রের যাবতীয় ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মাণকার্য্যও চালাইয়া যাওয়া অতীব কষ্টকর শ্রমের ব্যাপার হইয়াছে। সুতরাং আর প্রত্যাশা করিও না যে, ঘন ঘন অনেক পত্র লিখিতে পারিব।

তথাপি আজ দুই দিন যাবৎ প্রায় শত চারি পত্র ডাকে দেওয়া হইতেছে। পত্রগুলির অধিকাংশ চারি বৎসর আট মাস আগে লিখিত হইয়াছিল। ডাকে দিতে যাইবার পূর্ব্বক্ষণে জানা গেল যে তোমাদের ওখানে মণ্ডলীর ব্যাপার নিয়া তোমরা নানা বিষয়ে নানা উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া প্রায় প্রত্যেক অখণ্ডের মনের আবহাওয়াতে বিশৃঙ্খলা কায়েম করিয়াছ। সুতরাং পত্রগুলি তখন আর ডাকে দেওয়া হইল না। নববর্ষের শুভ আশীর্ব্বাদগুলি আমি নিজের ঘরেই যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলাম। কারণ, মন যাহার উত্তেজিত, বিদ্বিষ্ট, আক্রুষ্ট ও হিংসাবুদ্ধি-পরায়ণ, ঈর্ষ্যাকাতর, সৎকথা তাহার কোনও কাজে লাগে না। এতদিন ধরিয়া ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া বর্ত্তমানে অনুভূত হইতেছে যে, তোমাদের মনের অবস্থা যেন স্নিগ্ধ হইয়া আসিতেছে। এই জন্য ঐ সকল সংরক্ষিত পত্র অন্যকার ডাকে নানা নামে নানা খামে পোষ্ট হইয়া যাইতেছে। কিছু তোমার নামীয় খামের ভিতরেও দিয়া দিতেছি। পত্রগুলি পাঠ করিয়া যথাপাত্রে দিয়া দিবে।

চিঠি লিখিতে তোমরা কম লিখ না। অথচ ভুলিয়া যাও যে, চিঠি লেখা আর চিঠি পাওয়া বড় কথা নহে, বড় কথা নিরন্তর পরমেশ্বরের নামের সহিত মনকে যুক্ত রাখিয়া সাধ্যমত সর্ব্বজনহিতকর কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত করা। এই আসল কর্ত্তব্যটীর প্রতি তোমরা মনোনিবেশ করিলে আমার যে কত শ্রম কমিয়া যাইতে পারে, তাহা তোমরা যে

বাবা অনেকে চিন্তামাত্রও কর না। আমি তোমাদের কাছে কি চাহি? সম্মান? প্রণাম? পূজা? অর্থদান? এসবের কিছুই আমি চাহি না। আমি চাহি, তোমাদের যাহার যেটুকু সাধ্য আছে, নিজ সামর্থ্যের সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, স্বাভাবিক কর্ত্তব্য হিসাবে জগজ্জনের কুশলানুধ্যানে ও কুশলসাধনে ব্রতী হওয়া। একা একটা মানুষ মানব-জাতির দুঃখের কতটা দূর করিতে পারে? কিন্তু সকলে ঐক্যবদ্ধ হইয়া, সমমনা হইয়া, পরস্পর সম্প্রীতিসম্পন্ন হইয়া কিছু কিছু করিয়া চেষ্টা করিলে মহৎ দুঃখ নিবারিত হইতে পারে। কেহই যে একমাত্র নিজের সুখ ও স্বার্থ ছাড়া অন্য কাহারও সুখ ও স্বার্থের বিষয় ভাবিতেছে না, জগদ্ব্যাপী সকল দুঃখের মূল কারণ ত ইহা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪শে পৌষ, বুধবার, ১৩৮০
(৯ জানুয়ারী, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অন্য কোনও দিক দিয়া আমার কিছুই আফশোষ করিবার ছিল না। অযাচিত দান আপনা আপনি না আসে ত অযাচক আশ্রম আছে। সেখান হইতে টাকা আনিয়া অর্থকৃচ্ছ্র দূর করিব। বড় প্রিন্টিং মেশিনটা ইটালি হইতে আসিয়া বারাণসীতে বসিয়া যাইবার পরে আর

যাহার পরোয়া ? অযাচক আশ্রম প্রয়োজন-মত নগদ টাকায় মালটিভারসিটিকে সর্ব্বসম্পদ ঢালিয়া দিবে এবং কাজ চালাইয়া যাইবে বা চালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। অযাচক আশ্রম দানের টাকায় সৃষ্ট বা পরিচালিত হয় নাই, হইবে না। মালটিভারসিটির একটী মাত্র কেন্দ্র কালক্রমে স্বয়ম্ভর হইলে একটীর পর একটী করিয়া নূতন বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র সৃষ্টি খুব কঠিন কথা নহে।

অবশ্য, এগুলি কতকটা আগাম কল্পনার কথা। বাস্তব সত্য এই যে, এগার বার মাস ধরিয়া পুপুন্‌কীতে মালটিভারসিটির যাবতীয় নির্ম্মাণ-কার্য্য স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। সত্পায়ে সিমেণ্ট পাইবার উপায় নাই, সুতরাং কাজও সম্পূর্ণ করিবার উপায় নাই। ছাত্রাবাসের একতলারই ছাদ হইতে পারিল না, ফলে ছাত্রেরা অধ্যয়ন-ঘরে শয়ন পাতিয়াছে। সিমেণ্টের অভাবে অধ্যয়ন-ঘরের রেইলিংগুলিতে প্ল্যাষ্টারিং হইল না, ফলে অবিরাম গাঁথুনির একটু আধটু ক্ষতি হইতেছে এবং ঘর ও বারান্দা অপরিচ্ছন্ন থাকিতেছে। তিনটা মাত্র পাইখানায় বাটটি ছেলের অসুবিধা হয় কিন্তু আরও পাইখানা তৈরী কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। উৎসব-উপলক্ষ্য করিয়া যে চৌদ্দটী পাইখানা তৈরী করা হইয়াছে, তাহা উচ্চতার দিক দিয়া অর্দ্ধেক অসম্পূর্ণ, তাহা দূরে বলিয়া কচি কিশোরদের পক্ষে সেখানে গমনাগমন ক্লেশকর। বুঝিয়া দেখ। সকলের অত্যধিক আগ্রহ ও অনুরোধের আত্যন্তিকতা দেখিয়া অনিচ্ছাক্রমেই এবং অপ্রস্তুত অবস্থায়ই ১লা জানুয়ারী মালটিভারসিটির দ্বার খুলিয়া দিলাম। উৎসবের সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দরতার দিকে তাকাইয়া বিশ হাজার টাকার স্থায়ী আমানত ভাঙ্গিয়া যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করিলাম। এখন দেখিতেছি যে, ঘর-দুয়ারগুলির নির্ম্মাণ শেষ করিয়া

এবং গোশালার ঘরগুলি তৈরী করিয়া অন্ততঃ পনেরটী উৎকৃষ্ট গাভী কিনিবার পরে মালটিভারসিটিতে ছাত্র ভর্তি করা উচিত ছিল। গোশালার স্থানটা নীচু ছিল, পিলারের পর পিলার উঠাইয়া ফাঁকে ফাঁকে মাটি ভরাট করিয়া এমন স্থানে আনিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্যকে পৌছান হইয়াছে যে, এখন কেবল চতুর্দ্দিক বেড়িয়া মোটা একটা লিণ্টেল দিয়া দশ ইঞ্চি প্রস্থের দেওয়াল গাঁথিলেই একশত গাভীর প্রশস্ত বাসস্থান হইয়া যায়। লাখ দুই ইষ্টক এখনো পাঁজায় পড়িয়া গাঁথুনির স্থানে যাইবার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। বাদ সাধিল সিমেণ্ট। এ যুগে সৎ-লোকের সিমেণ্ট পাইবার উপায় নাই। দেওয়াল বরং চুণ দিয়া গাঁথিতে পারি, কিন্তু লিণ্টেল বা ছাদ ত চূণে হইবে না। এদেশে দুগ্ধ এখন আড়াই টাকা তিন টাকা কেজি। এতগুলি ছেলেকে দুধ খাওয়াই কি করিয়া ?

প্রিণ্টিং হাউস ছোট বিল্ডিং। কিন্তু তারও ছাদটুকুই বাকী। নূতন নূতন মুদ্রণ-যন্ত্র কলিকাতা হইতে আসিয়া প্যাকিং-বাক্সে বন্দী হইয়া আশ্রমে পড়িয়া কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাইতেছে, ছাদটুকু হইল না বলিয়া মেশিন বসান যাইতেছে না। প্রিণ্টিং মেশিন বসিয়া গেলে ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের সমস্যা মিটীয়া যাইত। পনের দিনের পাঠ্য বস্তু এক বা দুই দিনের পরিশ্রমে ছাপাইয়া দিতে পারিতাম। ছাত্রদের বহি কিনিবার অর্থ-ব্যয়টা বাঁচিত। বলিতে পার, অন্য লেখকের কপি-রাইটের উপরে অনধিকার-হস্তক্ষেপ করা হইবে। কিন্তু আমরা ত বিক্রয় বা প্রচারের জন্য এ কাজ করিতে যাইতেছি না! আর, এইটুকু ক্ষমতা বা যোগ্যতা কি আমরা রাখি না যে, বিষয়বস্তু এক বা

প্রায় এক রাখিয়াই অন্য যে-কোনও লেখকের লেখাকে নিজেদের শব্দে, ভাষায়, সাহিত্য-রসে পুষ্ট করিয়া আলাদা করিয়া রচনা করতঃ ছাত্রদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া যাইব? গান বা কবিতা বাদে আর সকল রকম সাহিত্য সম্পর্কে এই কথা খাটে। আমাদের প্রয়োজন হইতেছে জ্ঞানকে বিদ্যার্থীর অধিগত করিয়া দেওয়া। একজন সাহিত্যিকের "চেষ্টা"কে যদি আমরা "প্রয়াস" বলি, একজনের "দরকার"কে যদি আমরা "আবশ্যকতা" লিখি, একজনের "মর্জ্জি"কে যদি আমরা "খোশ-খেয়ালে"-এ রূপান্তরিত করি, তাহা হইলে কি বিদ্যার্থীর জ্ঞানের ভাণ্ডারে ঘাট্তি পড়িয়া যাইবে? নিশ্চয়ই যাইবে না। সারা বৎসরে যে বৃহদায়তন বহিখানার মাত্র বিশ বা পঁচিশ পাতা পড়া হইবে (এবং একই দিনে যেই পাতাগুলির সব পড়ান হইবে না।) সপ্তাহে যদি একদিন বা দুই দিন করিয়া তাহার দুই পাতা বা চারি পাতাকে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত করিয়া ছাত্রদের নিকটে ফুলস্কেপ শীট রূপে ফাইলে রাখিবার উপযুক্ত করিয়া ছাপাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহাতে কি জ্ঞানলাভের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবে? পাঠ্য-পুস্তক সংগ্রহের ব্যাপারে অভিভাবকেরা সরকারী কর্ম্মচারী হইতে সুরু করিয়া খুচরা দোকানদারদের দ্বারা যে ভাবে প্রতারিত হইতেছেন, আমাদের প্রতারণাটুকু তাহা অপেক্ষা অনেক ফিকা রংয়ের বলিয়া মনে হইবে না? একজন জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট স্তরের লোক এই সব বিষয়ে আইনের খুঁটিনাটি নিয়া প্রশ্ন তুলিয়া আমাকে নাস্তানাবুদ করিবার চেষ্টা এখানে করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছি যে, চুরী আর কালোবাজারী করার চেয়ে প্রকাশ্যে ডাকাতি করা অনেক ভাল।—তবে, সম্ভব-ক্ষেত্রে আমরা একাজে হাত দিবার আগে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার, নিবন্ধকার বা কবির

সম্মতি পাইবার চেষ্টা করিব। যিনি সাগ্রহে সানন্দে সম্মতি দিতে পারিবেন না, এমন সঙ্কীর্ণচেতা লেখক বা কবির লেখা বাদ দিয়া আমরা এখানকার বিদ্যার্থীদিগকে জ্ঞানে ও বিদ্যায় জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তুলিব। আমাদের দেশের দামী দামী বা নামকরা লেখকদের লেখা বিদেশের যে সকল লোক কখনো পড়েন নাই, এমন কি এসব লেখক বা কবির নাম পর্য্যন্ত শোনেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে কি প্রকৃত বিদ্বান লোকের, প্রকৃত জ্ঞানী মানুষের অভাব হইয়াছে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
২৭শে পৌষ, শনিবার, ১৩৮০
(১২ জানুয়ারী, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাকে যে পত্রখানা লিখিতেছি, আজ ঠিক সেই রকমেরই একখানা একজন সেবাদানপ্রার্থী সম্ভাব্য কর্ম্মীর নিকটে লিখিলাম। অনেকেই আমাকে বলিয়া থাকে যে, শ্রমের বিনিময়ে কোনও অর্থ-সম্পদ চাহে না। চাহে শুধু আশ্রমের পুণ্যময় পরিবেশে বাস করিয়া অন্তরে শান্তি পাইতে। আমি ইহার ঠিক মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। কারণ, আমাদের আশ্রমে দুঃখ, দারিদ্র্য, শ্রম ও ক্লান্তি ব্যতীত আর

কোনও আকর্ষণীয় বস্তু নাই। বহুখ্যাত আশ্রমগুলির ঐশ্বর্য্য, আড়ম্বর, বস্তু-সংগ্রহের সামর্থ্য, অবসর সময়ের চিত্তবিনোদনের উপকরণ প্রভৃতি কোনও লোভনীয় দ্রব্য নাই। আমি নিজেও বিশ্ববিদিত জগদ্বন্দিত কোনও সুবিখ্যাত পুরুষ নহি যে, আমার সংসর্গের ফলে কেহ মানুষের সমাজে মান, সম্মান, মর্য্যাদা, আদর, খাতির বা প্রতিপত্তি পাইতে পারে। আমি মনে করি যে, যাঁহারা এখানে বসিয়া মানব-সমাজকে সেবা দিতে আসিবেন, তাঁহাদের অনেকেরই আর্থিক প্রাপ্তিযোগের বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজন থাকিত না, যদি আমি বলিতে পারিতাম যে, আমার শরণাগত হইতে হইলে প্রত্যেককে সন্ন্যাস নিতে হইবে, আত্মীয়-পরিজনের প্রতি মায়া ও কর্ত্তব্য ভুলিতে হইবে। এই প্রয়োজন থাকিত না, যদি রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাগুলি দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের জঠরাগ্নির প্রজ্জ্বলনকে প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কেবলই উপহাস করিয়া না যাইত। এই প্রয়োজন থাকিত না, যদি রাজনৈতিক ক্ষমতালিপ্সু নানা দল ও নানা মতের লোকেরা দেশের প্রত্যক্ষ সেবাকে প্রত্যেকের সামান্যতম (commonest) কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিয়া তত্ত্বের লড়াইতে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ না করিয়া একটা একটা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাবকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হইত। এই প্রয়োজন থাকিত না, যদি দুশ্চরিত্র দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্জ্জয়-লোভপরবশ ভাগ্যান্বেষীরা গদি দখল করিয়া নিয়া আমলাদিগকে নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকূলে ব্যবহার করিয়া নিজেদিগকে লুণ্ঠন-তন্ত্রে স্থায়ী ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া না দিত। উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা যদি না ঘটিত; তাহা হইলে এমন পরিবেশ আপনা আপনিই সৃষ্ট হইত, যাহাতে সর্ব্বস্বত্যাগকামী যুবক কোনও সৎপ্রতিষ্ঠানে আসিয়া

জনসমাজের সেবা করিবার সময়ে বিরহী মাতার বা বন্ধুহীনা ভগিনীর দুঃখের কথা ভাবিতে বাধ্য হইত না। তখনই আমার পক্ষে বলা সহজ হইত যে, জনসেবা কর, বাড়ীতে টাকা পাঠাইয়া কি হইবে?

সুতরাং তোমাকে যদি পুপুন্‌কীর কাজে আনিতে হয়, আমাকে নিজের গরজেই তোমাকে মাসে মাসে সঙ্গত একটা পরিমাণ দিবার জন্য আর্থিক সুব্যবস্থা করিয়া লইতে হয়। অথচ আমি অযাচক, অভিক্ষু, কোথাও কোনও চাকুরী-বাকুরীও নাই।

এই কারণেই তোমাকে লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, হঠাৎ করিয়া আশ্রমে আসিবার বুদ্ধি করিও না। যেখানে আছ, সেখানে থাকিয়াই কিছু রুজি-রোজগার করিয়া তোমার বৃদ্ধ পিতাকে সহায়তা করিতে চেষ্টা কর। আমার হাতে এখন কাপড় বড় কম, এজন্য বড় বড় মাপের কোট তৈরী করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মাত্র পঁচিশ বস্তা সিমেণ্ট হইলে গোধনের দালানটার পাটাতনের (Plinth) উপরের লিণ্টেলটা দিতে পারি। আজ এগার মাসের চেষ্টায় তাহা পারিলাম না। এই লিণ্টেলটা হইয়া গেলেই তর্ তর্ করিয়া চূণবালির গাথুনিতে আকাশের দিকে উঠিবার জন্য দুই লক্ষ ইষ্টক পাঁজায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। অবশ্য, লিণ্টেলের পরে কাদার গাথুনিও দিতে পারি, কিন্তু তাহা সঙ্গত হইবে না। কেননা, পুরাতন আশ্রমের কাদায় গাঁথা গৃহগুলি সব ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। সস্তায় কাজ করিব বলিয়া একেবারে অত সস্তায় যাইতে পারি না। গোধনের ঘর যদি একমাস মধ্যে শেষ হইয়া যাইতে পারিত, তাহা হইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে আশ্রমে পঁচিশ ত্রিশটী দুগ্ধবতী গাভী আসিয়া যাইবার পথে অন্য বিঘ্ন দেখি না। ষাট-সত্তরটি ছাত্র ও শিক্ষকের মুখে আমি দুগ্ধ দিতে পারিতেছি না। এমতাবস্থায়

আমি কি আশ্রমের কর্ম্মীর সংখ্যা অকারণে বাড়াইতে পারি বাবা ?

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুনকী আশ্রম
২৭ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। গ্রহাচার্য্য ব্রাহ্মণ তাঁহার সামুদ্রিক গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, তোমার পত্নী শ্রীমতী—র গুরুতর ফাঁড়া আসিতেছে এবং তাহা কাটাইবার জন্য গ্রহশান্তি ও প্রবালরত্নাদি ধারণের প্রয়োজন, আর সেই জন্য একুশ টাকা খরচের প্রয়োজন, এসব সংবাদ শুনিয়া বিন্দুমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। এ দেশটাই সমগ্রতঃ গ্রহের ফেরে পড়িয়া আছে, নতুবা গ্রহাচার্য্যদের জীবিকার ব্যবস্থা কি করিয়া হইত ? গৃহীতে আর সন্ন্যাসীতে মিলিয়া মানুষের ভবিষ্যদ্দর্শী পুরুষ-নারী এই ভারতে হয়ত দশ লক্ষেরও বেশী। নিজের ভবিষ্যৎ ইঁহারা কেহই গণনা করিয়া বাহির করিতে পারেন না কিন্তু ভয়াতুর সহজ-বিশ্বাসী সরল-চিত্ত মানুষ মাত্রেরই ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া ইঁহারা তাহাদের প্লীহা চমকিত করিয়া থাকেন। ইঁহাদের গণনা-শাস্ত্র সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, না মিথ্যা, একথা আমি বলিতে পারিব না। কিন্তু গ্রহকে ভয় পাইও না, বিপদে

ডরাইও না, ভবিষ্যৎ যতই বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকুক না কেন, ঘাবড়াইও না,—একথা বলিবার লোকই আজ দেশের প্রয়োজন।

বস্তুগুণ অবশ্য অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু যে-কোনও বিপৎসম্ভাবনায় প্রবাল বা রত্ন ধারণের চেয়ে একটী বিল্বমূল বা তুলসীমূল ধারণ অধিকতর ফলপ্রদ।

সুতরাং তোমরা গ্রহাচার্য্যের পিছনে একুশটী টাকা খরচ না করিয়া তাহা সমবেত উপাসনার দক্ষিণা রূপে ব্যবহার করিয়াছ জানিয়া অত্যন্ত সুখানুভব করিলাম। যে সকল পূর্ব্বসংস্কার তোমাদের দুর্ব্বলতা ও দৈবনির্ভরতা কেবল বর্দ্ধন করিয়া চলিবে, আস্তে আস্তে তোমরা সেই সকল পূর্ব্বসংস্কার পরিহার করিয়া যতটা সম্ভব কুসংস্কার-মুক্ত হও। কেননা, বিশ্বের সকলের সহিত মনে প্রাণে মিলিয়া যাওয়াই তোমাদের সাধনার পদ্ধতি। দুনিয়া-জোড়া লক্ষ লক্ষ কুসংস্কার মানুষের সহিত মানুষের সহজ মিলনকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যে যতটুকু কুসংস্কারমুক্ত হইবে, সে অপরের সহিত মিশিতে তত যোগ্য হইবে।

একটী মাত্র পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া তোমরা পরমেশ্বরের সৃষ্ট সকল জীবকে তোমাদের অন্তরের সন্নিহিত কর। অন্যেরা বহুর পূজা করিতেছে দেখিয়া রুষ্ট হইও না, কিন্তু কি করিলে তাহারা একের পূজার জন্য অগ্রসর হইতে পারে, সেই বিষয়ে চিন্তা-চেষ্টা শুরু কর। তোমাদের লক্ষ্য হউক যুগপৎ আত্মগঠন ও জীবোদ্ধার। পত্রখানা মণ্ডলীতে পাঠ করিয়া সকলকে শুনাইও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আশা করি, আমার পূর্ব্বপত্র পাইয়াছ এবং কল্যাণীয়া মা বা—র আবশ্যকীয় অস্ত্রোপচার নিরাপদে হইয়া গিয়াছে। জরায়ুর এমন কতকগুলি দুর্লক্ষণ আছে, যাহার আভাস দেখিলে বিজ্ঞ শল্য-চিকিৎসকেরা অবিলম্বে সমগ্র জরায়ু উৎপাটন করিয়া রোগিণীর ভবিষ্যৎ জীবন ও স্বাস্থ্য নিরাপদ করিবার চেষ্টা করেন। এরূপ ক্ষেত্রে জরায়ু-অপসারণ বাঞ্ছনীয়। আশা করি, হাসপাতালের কর্ত্তব্য চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিণী ভাল ভাবেই করিয়াছেন এবং কল্যাণীয়া মা সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরিয়াছে।

ইহার পরবর্ত্তী কালটা তোমাদের পক্ষে বিশেষ সংযম সহকারে পালনীয়। সমগ্র জরায়ুর অপসারণ ঘটিলে সন্তান আর হইবে না। এই নিশ্চিন্ততা যেন তোমাদের আচরণ বেপরোয়া না করে। কারণ, মনের সংযম দেহকে সংযত করে, দেহের সংযম মনকে সুগঠিত করে। এই যে তোমরা প্রায় প্রতিটি কার্য্যে সহজকে জটিল, সরলকে কুটিল, অবারিতকে গ্রন্থিল, অনাবশ্যককে ফেনিল করিয়া তোল, তাহার মূল-তোমাদের অসংযত গুপ্ত জীবন রহিয়াছে। উদ্দামকর্ম্মশীল রুদ্রবৎ তেজস্বী ব্যক্তিরাও যে অনেক সময়ে ক্ষণকালমধ্যে আশুতোষ ভোলানাথ

হইয়া সকলের সর্ব্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া হাসির ছটায় দিগন্ত আনন্দ-শিহরণে ভরিয়া দেন, তাহাও তাঁহাদের গুপ্ত জীবনে সংযমেরই ফল। কি গৃহী, কি প্রব্রজিত, প্রত্যেকেরই গুপ্ত জীবনে সংযম এক স্বরভি বিস্তার করিয়া থাকে। তোমরা যে অপরের সঙ্গত নেতৃত্ব দেখিলে ক্ষেপিয়া যাও, গুরু-বাক্যকেও গুরুত্ব না দিয়া নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হও এবং পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে কর্দ্দমক্ষেপণে প্রবৃত্ত হও, তাহারও মূল উৎস গুপ্ত জীবনের অসংযম। সংযম মানুষকে অপর মানুষের সহিত মিলিবার মন, মেজাজ ও সামর্থ্য প্রদান করে। ব্যক্তিগত ভাবে তোমরা প্রায় প্রতি জনেই অশেষ গুণশালী। কিন্তু আভ্যন্তর জীবনে সংযম নাই বলিয়া সেই সকল সদ্গুণের সদ্ব্যবহার না করিয়া আত্মকলহে, মিথ্যা মর্য্যাদার ভ্রমে অপব্যয়িত করিয়া দিতেছ। ইহার চাইতে দুঃখকর ব্যাপার আর কি হইতে পারে? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা —, তোমরা সকলে স্নেহ ও আশিস নিও।

জামশেদপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, খড়্গপুর, বেলদা, আসানসোল ধানবাদ, ঝরিয়া আদি স্থান হইতে এক দিনের যাত্রীরা যে দলে দলে

পুপুন্‌কী আশ্রমে সমবেত হইয়াছিলে, তাহাতে কি যে আনন্দিত হইয়াছি, কি বলিব। ১লা জানুয়ারীর অনুষ্ঠান তোমাদের সকলের মনোহরণ করিয়াছে জানিয়া আমার খুশীর অবধি নাই। কিন্তু ছাত্রাবাসের একতলারও ছাদটা করিতে না পারায় এবং গোধনের গৃহনির্ম্মাণ শেষ না হওয়াতে বিদ্যার্থীদেরই থাকিবার কষ্ট হইতেছে আর দুগ্ধাভাবে উহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইবে কিনা, এই আশঙ্কায় আমি মনে মনে বড়ই উদ্বেগ ভোগ করিতেছি। কিন্তু প্রিন্টিং প্রেসের ছাদটা শেষ না করিয়া এই সব কাজে হাত দেওয়া অসম্ভব। আগামী কল্য হইতে প্রিন্টিং প্রেসের কাজ ধরা হইবে। পনের বিশ দিনে যদি কাজ শেষ করিতে পারি, তাহা হইলে গোধনের প্লিন্থের লিণ্টেল ধরিতে আর দেরী করিব না। গৃহনির্ম্মাণের পরে আর গাভী ক্রয়ে বিলম্ব করিব না। এদেশে গরুর সেবা কেহ জানে না। যত্নের নামে অযত্ন করিয়া আশ্রমের কয়টা গাভী যে পর পর খারাপ করিয়া দিল, কি বলিব। এজন্য উত্তর প্রদেশে ভাল গো-সেবক খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য জরুরী পত্র দিয়াছি। কাজ আমি দ্রুতই করিতে চেষ্টা পাইতেছি কিন্তু আগে ছাত্র ভর্ত্তি করিয়া ফেলিয়া ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িয়া দেওয়াতে প্রতি কার্য্যে বিষম বাধা, অসুবিধা ও বিশৃঙ্খলা অনুভব করিতেছি। ষাটটী ছাত্র একটা তুচ্ছ ব্যাপার নহে। প্রত্যেকের কত দিক যে দেখিতে হইতেছে। তবে, প্রাণপণ করিয়া প্রতিজনকে আনন্দে রাখিবার চেষ্টা করিতেছি। সাধনা, অঞ্জন, কানাই সারা দিন ইহাদের খেজমতেই রহিয়াছে। গ্রাম্য কুশিক্ষা, পারিবারিক জীবনের কদর্য্যতা, জন্মজাত অপসংস্কার আদির প্রভাব হইতে এই নবাগতদের মুক্ত করিতে কয় মাসের আয়ু দিতে হইবে, এখনো অনুমান করিতে

পারিতেছি না। তবে, লাগিয়া আছি। অন্য সকল কাজ এখন গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। ইতিমধ্যেই এক ছাত্র অপর ছাত্রের ট্রাঙ্কের তালা খুলিয়া গুড়ের চাকে দাঁত বসাইয়াছে, এক ছাত্র নানা মিথ্যা অভিযোগ জানাইয়া বাড়ীতে পত্র লিখিয়াছে। এক ছাত্র সঙ্গীত-শিক্ষকের টাকা চুরি করিয়াছে। পরীক্ষা না করিয়া ছাত্র-ভর্ত্তির ইহা ফল। শাসন করিব, তবে এখানে বেত্রাঘাত বা শারীরিক শাসন নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৮ পৌষ, রবিবার, ১৩৮০
(১৩ জানুয়ারী, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

হাজার পত্র আসিতেছে। প্রত্যেকটা কি পড়া সম্ভব ? কয়খানারই বা উত্তর দেওয়া সম্ভব ? উত্তর দানে দেরী হইলে কেহ মনে দুঃখ নিও না। আমি সাধ্যমত প্রাণপণ চেষ্টা করি।

শ্বেতী কোনও সংক্রামক রোগ নহে। কনের শ্বেতী থাকিলে তাহার বিবাহ হইবে না, ইহা অন্ধ গোঁড়ামি। তবে মায়ের বা বাপের শ্বেতী থাকিলে সন্তানদের শ্বেতী হইবার সম্ভাবনা থাকে। একথা অস্বীকার করা যায় না।

কোনো মেয়ের ভ্রাতার শ্বেতী আছে বলিয়া তার গর্ভজাত সন্তানের শ্বেতী হইবেই, এমন বলা চলে না। কোনো মেয়ের ভগ্নীপতির শ্বেতী থাকিলে ভগিনীর গর্ভজাত সন্তানেরই শ্বেতী হইলে হইতে পারে, মেয়েটীর নিজ সন্তানের শ্বেতী হইবে কেন?

কন্যা যদি গুণবতী ও স্বাস্থ্যবতী হয়, তাহা হইলে মাত্র শ্বেতীর জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করা কোনো কাজের কথা নহে। মনের দিক দিয়া যদি মিল হইয়া থাকে, আদর্শের দিক দিয়া যদি এক হইয়া থাকে, অভিভাবকদের যদি সম্মতি ও আশীর্ব্বাদ থাকিয়া থাকে, তবে নির্ভয়ে এই মেয়েকে বিবাহ কর। বিবাহের পরে জীবনকে যথাসাধ্য জগৎ-কল্যাণকর্ম্মে নিয়োজিত রাখিবে, এই পণ কর।

বিবাহের ব্যাপারে কেহ আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসিলে আমি কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে ইহাই বলিয়া থাকি যে, জাতি, বর্ণ, ধর্ম্ম, দেশ, ভাষা বা সংস্কৃতির গণ্ডী ভেদ করিয়া নিশ্চয়ই তোমরা সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পার, যদি জীবনের উদ্দেশ্য হয় জগৎকল্যাণ এবং ঈশ্বরোপাসনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৮ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইয়াছি। যেখানে তোমরা ষাট জন সমদীক্ষিত গুরুভ্রাতা ও ভগিনী আছ, সেখানে অপর অধিকাংশের উদাসীনতা সত্ত্বেও তোমরা মাত্র সাত জনে চেষ্টা-চরিত্র করিয়া একটী সফলতাপূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছ জানিয়া তোমাদের সাহস, নিষ্ঠা ও ভক্তির প্রশংসা করিতেছি। কিন্তু এইটুকুই শেষ কথা নহে। তোমরা তোমাদের কাজে লাগিয়া থাক। হাজার হাজার অজ্ঞ মানুষ তোমাদের সংস্পর্শে আসিয়া বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হউক। তাহারা জানুক, বুঝুক, উপলব্ধি করুক যে, জীবনের একটা মূল্যও আছে, স্বাদও আছে। ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে শাশ্বত করার উপায় আছে।

১৯২৭ ইংরাজির এপ্রিল মাসে তুমি দীক্ষিত হইয়াছিলে, তাহা আমার মনে আছে। পূর্ণ পঁয়তাল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় যখন যেখানে গিয়াছ, আমার পতাকাই তুমি ধারণ করিয়া চলিয়াছ, ইহা আমার জানা আছে। তোমার বিবাহ হইলে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, রাত্রে বিছানায় শুইলে মনে করিবে যে, তোমার পাশে একটী শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড শুইয়া আছে। সেই শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড নিজ সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছে কিন্তু আজ সত্তর বৎসর বয়স লইয়া তুমি বিদ্যমান রহিয়াছ। তোমার ভিতরে আছে একজন জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী, যাহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর সুদীর্ঘকালীন

সংযম-ব্রতে একান্ত মনে করিয়া আসিয়াছে সাহায্য। সে তোমার বলহরণ করে নাই, তোমাকে বল দিয়াছে। তুমি তাহার সঙ্গে পড়িয়া পথভ্রান্ত হও নাই, নিয়ত ঠিক পথে স্থির ভাবে রহিয়াছ। তাহার ও তোমার মিলিত সাধনা দুই জনকে প্রতিটি শ্বাসে ও প্রশ্বাসে এক করিয়া দিয়াছিল। তোমার সমগ্র শরীর ও মন সেই স্মৃতির সুরভি বহন করিয়া বেড়াইতেছে। তাই আজ তুমি তোমার এই সত্তর বছর বয়সেও আমার কাছে একজন নির্ভরযোগ্য কর্ম্মী। তুমি আত্মবিশ্বাস না হারাইয়া এই পাহাড়ী অঞ্চলের দরিদ্র বস্তিতে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া যাও। জয় তোমার অবশ্যম্ভাবী।

জীবনে যে একদিনের জন্যও ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, সে আমার প্রিয়। যে জন এক সপ্তাহের জন্য পালন করে, সে প্রিয়তর। যে জন এক মাসের জন্য পালন করিতে পারে, সে আমার প্রিয়তম। যে পারে সম্বৎসরকাল পালন করিতে, সে আমার সহিত অভেদাত্মা ও অভিন্ন। যে পারে দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া পালন করিতে, সে আমার নিকটে আরাধ্য দেবতার তুল্য আদরণীয় ও পূজ্য। আমার দৃষ্টিতে ব্রহ্মচর্য্যের ইহাই মূল্য।

ব্রহ্মচর্য্যের ফল তেজ, সাহস, শৌর্য্য, মতিবুদ্ধির স্থিরতা এবং সুদীর্ঘকালব্যাপী বিশাল প্রযত্ন পরিচালনের সামর্থ্য। সেই সামর্থ্য ও গুণাবলি পুঞ্জিত হইয়া তোমার মধ্যে রহিয়াছে। তুমি তাহাদের সদ্ব্যবহারে ব্রতী হও।

আগে তুমি নিজেকে নিতান্ত তুচ্ছ মানুষ ভাবিয়া বিজ্ঞ সমাজে দুরু-দুরু বক্ষ লইয়া প্রবেশ করিয়াছ। এখন আর তোমার দ্বিধা-সঙ্কোচের কোনও কারণ নাই। বিজ্ঞেরা প্রায়শঃই কর্ত্তব্যকে দূরে রাখিয়া গা-

বাঁচাইয়া চলিতে আগ্রহী হন। তুমি অজ্ঞ, মূর্খ, নিরক্ষর ও অশিক্ষিতদের মধ্যে দ্রুত প্রবেশ কর। ভালবাসা দিয়া তাহাদের হৃদয়কে জয় কর। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য যে কিছু কালের জন্যও পালন করিয়াছে, যে-কোনো ব্যক্তিকে সে নিষ্কলুষ ভালবাসা দিয়া আকর্ষণ করিতে পারে। তুমি অবজ্ঞাতদিগকে কোলে তুলিয়া আন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৮ পৌষ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা,—তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ত্যাগানুশীলনের বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলাম। সৎকার্য্যে যাহা-কিছু দান করিয়াছ, তাহা তুমি যে কায়ক্লেশে সংগ্রহ করিয়াছ, তাহা জানিয়া পুলকিত হইলাম। যাহার অনেক আছে এবং দানে ক্লেশ নাই, তাহার দান অপেক্ষা, যাহার অনেক নাই, কিছু দিতে হইলে কায়িক শ্রম দ্বারা ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার দানের মূল্য বেশী, কৌলীন্য ও সম্ভ্রম অধিক। বস্তুগত ত্যাগ এবং ইন্দ্রিয়গত সংযম মানুষকে ক্রমশঃ দেবত্বের স্তরে উন্নীত করে। ত্যাগ স্বীকার করিবে সর্ব্বদা মহত্তম লক্ষ্যে আর ইন্দ্রিয়-সংযম করিবে মনুষ্য-দেহকে দেবদেহে পরিণত করিবার জন্য।

স্বামী ভিন্ন মতে দীক্ষিত হইলে সংযমেচ্ছুকা স্ত্রীর যে সংযম-সাধনে বিঘ্ন হইবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু একদা যাঁহাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া স্বামিত্বে বরণ করা হইয়াছে, এই ব্যাপারে তাহার সহিত বিরোধ করিয়া চলা সুকঠিন এবং অশান্তিজনক। কিন্তু স্বামীর গৃহীত ধর্ম্মমতে কোথাও না কোথাও সংযমের নিশ্চয়ই প্রশংসা আছে। স্বামীর ধর্ম্মমতের প্রতি প্রতিকূলভাবাপন্না না হইয়া সেই ধর্ম্মমতানুসারে সংযমের যেখানে প্রশংসা, সেই দিকে স্বামীর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিতে হইবে। বুদ্ধিমতী মেয়েদের পক্ষে একাজ খুব কঠিন নহে।

বিবাহ করেই মানুষ সহবাস করিবার জন্য, অন্যান্য কাজ ইহার তুলনায় গৌণ ত। এইরূপ ভাবাপন্ন লোকের সংখ্যাই পৃথিবীতে অধিক। সহবাসও যে একটা যোগসাধনা এবং এই যোগসাধনাও যে কাহাকেও কাহাকেও মোক্ষপথে অগ্রসর করিয়া দেয়, তোমার আমার পূর্ব্বপুরুষদের মধ্যে অনেকে এই ধারায়ও চিন্তা করিতেন। তাঁহারা স্বামিস্ত্রীর মৈথুন-মিলনকে ঘৃণার চক্ষে না দেখিয়া পরমা প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষের মিলন সাধনের একটী ব্যবহারিক রূপ বলিয়া মনে করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জাতীয় অধ্যবসায় হইতে অনেকে মুক্তির দুঃখহারিণী সুধাও আহরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই পথ গৃহীর, সন্ন্যাসীর নহে। এই জন্য এই বিষয়ে আমি সবিস্তার কিছু বলিব না।

তোমার স্বামীকে তুমি কলহের রাস্তায় জয় করিতে চাহিও না। তাহাকে স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার রাস্তায় জয় করিবার সঙ্কল্প কর। যতক্ষণ মানুষ ইন্দ্রিয়ের দাস, ততক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সেবা ব্যতীত তাহার সুখ নাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখ-সংগ্রহে স্বামীকে সহযোগিতা করিবার সময়েও স্ত্রী সুকৌশলে তাহার স্বামীর মনকে অতীন্দ্রিয় সত্যের দিকে

আকর্ষণ করিতে পারে। কি ভাবে পারে, তাহার উপায় তোমাকেই চিন্তা করিতে হইবে, তোমাকেই উদ্ভাবন করিতে হইবে। একাগ্র মননে যদি চেষ্টায় লাগিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার সাহায্যকারিণী গুরুশক্তি নিরত তোমাকে সহায়তা দিয়া যাইবে।

এই পত্রেই আমি তোমার স্বামীকে আমার স্নেহ ও আশিস জানাইতেছি। ভিন্ন গুরুর শিষ্য হইলেও আমার বিমল স্নেহের সে স্বাভাবিক অধিকারী। তোমাকে যেদিন দীক্ষা দানের দ্বারা সহস্র সমদীক্ষিতদের সমক্ষে আপন করিয়া লইলাম প্রকাশ্যে, সেদিন তোমার স্বামীকেও আমি আপন করিয়া লইয়াছি সকলের অলক্ষ্যে। আমার সন্তানের স্বামী আমার পর থাকিতে পারে না। আমার সন্তানের পত্নী আমার পর রহিয়া যায় না। আমার স্বার্থগন্ধহীন নির্মল স্নেহ তোমাদের উভয়ের জীবনকে সত্য, শিব ও সুন্দরের দিকে ধাবিত করিবে। কেবল পশুর মতন সন্তানের জন্ম দিয়াই তোমরা খালাস নহ, তোমাদের মানব দেহকে তোমরা সুনিশ্চিতই দেবদেহের মর্য্যাদা দান করিয়া তারপরে ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের প্রতি আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে করিতে প্রয়াণ করিবে, এই জন্যই তোমাদের মানবতনুধারণ। ইতি—আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২২ মাঘ; মঙ্গলবার, ১৩৮০
(৫-২-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অলৌকিকতা দ্বারা মহত্তের মহিমা নিরূপিত হয় না, লৌকিক জীবনের অসাধারণত্ব দিয়াই তাহার বিচার হয়। যীশুর জন্মকথাতে অলৌকিকতা আছে কিন্তু তাঁহার প্রতি অশেষ ভক্তি সত্ত্বেও আমরা অবৈজ্ঞানিক ব্যাপারটুকু উপহাস না করিয়া নিঃশব্দে শুনিয়া যাই। যীশু-বিদ্বেষীরা ইহার প্রতিবাদে ইহা অলীক বলিয়া বর্ণনা করে। আমরা যীশুর ভক্ত, তাই, ব্যাপারটা না বুঝিলেও সম্ভ্রম সহকারে মৌন রাখি।

মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় অপৌরুষেয় জন্ম পাইয়াছেন বলিয়া একখানা ছাপান গ্রন্থে দেখিয়াছি, একটী নাটকের পাণ্ডুলিপি হইতে শুনিয়াছি। ভগবান যীশুর কাহিনীর ইহা দৃষ্টান্তানুসরণ মাত্র, সত্য হইতে পারে না।

বার্ণপুরে গিয়া শুনিলাম, প্রভু জগদ্বন্ধুকে নিয়া একটী নাটকে ঠিক এই কথাটীই অভিনীত হইয়াছে। তাঁর জন্মের জন্য পিতার নাকি আবশ্যকতা পড়ে নাই। কে কি ভাবে কথাটা নিয়াছে, জানি না। আমি এই কথা বিশ্বাস করি না।

আমার জন্মের জন্যও পিতার আবশ্যকতা ছিল, মাতার প্রয়োজন ছিল। আমার জন্ম অপৌরুষেয় নহে, আমি এই শরীর অযোনিজ নিয়মে পাই নাই। কিন্তু আমার পিতা ও মাতা উভয়ে আত্মসংযমী যোগী ছিলেন এবং তাঁহাদের তপস্যারই ফল এই দেহে পূর্ণতঃ বিদ্যমান। "বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য" গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে যেখানে ভগবান্ যীশুর জন্মকথা আলোচিত হইয়াছে, সেখানে খুঁজিলে হয়ত প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিবে।

সম্প্রতি আমাকে অসাধারণ এক মহাপুরুষ রূপে প্রতিভাত

করিবার জন্য ভক্তগণের মধ্যে স্বভাবতঃই যে অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপারে চর্চ্চা চলিতেছে, তাহার প্রতি আমি সহানুভূতিশীল নহি। কোনও একজন দৃষ্টিশক্তিহীনা বর্ষীয়সী মহিলা কবি প্রাণের ভক্তির উচ্ছ্বাসে যাহাই লিখিয়া থাকুন, আমি কিন্তু সাধারণ একটা মানুষ ছাড়া আর কিছুই নহি। আমার জন্মকালীন নানা ঘটনার সহিত অনেকের অনেক অসাধারণ দৈবী অভিজ্ঞতার বিবরণ আমিও শৈশব কাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু সেগুলি অধিকাংশই এমনই পরস্পর বিরোধী যে, যুক্তিমান্ ব্যক্তিরাও সেগুলি আলোচনা দ্বারা কোনও তথ্য উদ্ধারে বা সত্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইবেন না। সুতরাং এই রকমের অধ্যবসায় হইতে তোমরা প্রতিজনে প্রতিনিবৃত্ত হও। যাহাকে অলীক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, তাহা সম্পূর্ণতঃ অলীক নাও হইতে পারে কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে মানুষ যে কথা বুঝিবে না, তাহা বর্জ্জন করিয়াই আলোচনা চলা উচিত।

পৃথিবীর সব দেশেই নিজ প্রিয় জনকে প্রচার করিবার জন্য অলৌকিক ঘটনার প্রচার একটা অভ্যস্ত নিয়ম। এদেশে তাহার মধ্যে মাত্রাধিক্য কিছু অতিরিক্ত রকমের। শুনাশুন্ কথা বা hearsay, জনরব বা প্রবাদবাক্যই এদেশে একেবারে অকাট্য প্রমাণের স্থান গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহ অবতার কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসা এদেশে অমুক তর্কতীর্থ বা তমুক বৈরাগী বা তমুক ভৈরবী বা অমুক দারোয়ান বা তমুক ঝাড়ুদার বা তমুক জমিদারের মুখের কথার দ্বারা অনায়াসে হইয়া যায়। সুতরাং অবতার-পদপ্রার্থীরা বা অবতার-সৃষ্টি-কারকেরা বিনা ওজরে, বিনা আপত্তিতে, কুণ্ঠাহীন ভাবে যে-কোনও ব্যক্তির মুখের কথাকে বেদবাক্য জ্ঞান করিয়া গ্রহণ করেন বা প্রচার করেন।

এই সব দুর্বলতা তোমাদের থাকা উচিত নহে।

আমার জীবনে অলৌকিক ঘটনা নাই, ইহা নহে। তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প; ইহাও নহে। চমৎকারিত্বের দিক দিয়া তাহারা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর, ইহাও নহে। তথাপি বলিব, এই সকল অলৌকিক ব্যাপারের প্রচারের দ্বারা জগতের কোনও কুশলই লব্ধ হইবার কারণ নাই। লোকপাবন লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অলৌকিক কাণ্ডগুলি নিয়া মানুষ কত হুলস্থূলই করিল, ফলে মানুষের কাছে তাঁহার বিমল ব্রহ্মজ্ঞান চাপা পড়িয়া গেল, কেহ তাহার সান্নিধ্য পাইল না। রামকৃষ্ণ-পরমহংসদেব অলৌকিক ব্যাপারকে অবহেলা করিয়া চলিলেন, অন্যকে অবহেলা করিতে বাধ্য করিলেন, যার ফলে আজ প্রায় সমগ্র পৃথিবীই তাঁর ভক্ত বা অনুরাগী এবং সকলের মুখেই তাঁর বাণী, তাঁর প্রশংসা। অবতার-বাদের সস্তা কিস্তি দিয়া আসর মাৎ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাধারণ মানুষ রূপে আমাকে তোমরা বুঝিতে, বুঝাইতে, জানিতে, জানাইতে চেষ্টা কর। তাহাতে তোমাদের সংঘও লাভবান্ হইবে, তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে সেই পরম লাভের ভাগ পাইবে। আমি যদি অলৌকিক কিছু হইয়া থাকি, তবে সাধারণ লোকে আমাকে অনুসরণ করিবে কি করিয়া? আমি নিতান্ত লৌকিক মানুষ বলিয়াই ত তোমরা আমাকে তোমাদের এত কাছে পাইয়াছ এবং আমার স্নেহচ্ছায়ায় ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে পারিতেছ। একজন অতীব অসাধারণ অসামান্য মানুষ হইয়া আমার আনন্দ নাই, তৃপ্তি নাই, আমার আনন্দ ত সেইখানে, যেখানে কোটি কোটি মানুষ ঠিক আমাতে পরিণত হইয়া যাইতেছে। আমার শান্তি ত সেইখানে, যেইখানে অনন্ত কোটি আগত

অনাগত মানুষ স্বরূপানন্দ হইয়া যাইতেছে। অবতার হইয়া পূজা পাইবার শখ আমার নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২২ মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বদরপুরে ও তিনসুকিয়াতে তুমি যে কাজটুকু করিয়া আসিয়াছ, তাহাতে আমি খুব তৃপ্তি অনুভব করিতেছি। নিরহঙ্কার, নিরভিমান, সুবিনীত মনে নিষ্ঠার সহিত কাজ করিলে সে কাজের ফল শুভ হয়, স্থায়ী হয়, ব্যাপক হয়। পড়াশুনার কাজে ক্ষতি না করিয়া, নিজের ব্যক্তিগত মহত্ত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, নিজের বিবেকের কাছে কদাচ হেয় না হইয়া, কোনও অপ্রত্যাশিত প্রতিকূলতার মুখে চরিত্রের জ্যোতিকে ম্লান না করিয়া যেখানে যখন যেটুকু কাজ করিতে পার, তাহাই প্রশস্ত। সংগঠন কথার প্রকৃত মানে শুধু বাহিরের লোকের কাছে উচ্চ ভাবের উদ্দীপনাকে ছুঁড়িয়া মারা নহে, নিজের আত্মশোধন, নিজের আত্মগঠন, নিজের অপূর্ণতাকে বিদূরণও বটে। ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ-বর্জ্জিত সুন্দর সরল মনটী লইয়া যখন যেখানে যে কাজটুকু করিবে, তাহা শ্রীভগবানের চরণে পৌঁছিবে। তবে, বর্ত্তমান সময়ে পড়াশুনাতে অবহেলা একেবারেই করিও না। বিদ্যার্জ্জনকে যোগ্যতা-সঞ্চয়ের একটী অঙ্গ বলিয়া জ্ঞান করিও।

আমি নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, তোমার জীবন-কমল শতদলে ফুটিয়া উঠুক। যে বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছ, এই বাধাগুলি শাশ্বত নহে। তোমার নিজের অস্তিত্বই শাশ্বত। এই বিশ্বাস রাখিয়া প্রতি পদে অন্তর্দৃষ্টি রাখিয়া পথ চল। * * *

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২২শে মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * *

তোমাদের জেলাতে সংগঠন-কর্ম্মীর সংখ্যা খুব কম। সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করা উচিত। সংগঠন-কর্ম্মীর সংখ্যা কম হইলে অন্যেরা এই স্বল্পসংখ্যক কর্ম্মীর কাজে কেবল ত্রুটি ধরে, দোষ আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করে এবং ইহাদের কাজের কোনও ফল হইতেছে না বলিয়া সমালোচনা করে। এই দোষটুকু হইতে তোমাদের প্রতিজনের মুক্তিলাভ প্রয়োজন এবং প্রয়োজন হইতেছে, প্রতিজনেরই নিজ নিজ হাতে কিছু কিছু করিয়া কাজের অংশ গ্রহণ।

দুই তিনটা দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছ হইতে এইরূপ পত্রই পাইলাম যে, অমুকের কাজের উৎসাহে ভাটা পড়িয়াছে, অমুকে নেতৃস্থানীয়দের

সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেছে না। ইহাতে আমি অস্বস্তি বোধ করিয়াছি। হাজার লোকে কেন এক সঙ্গে কাজে লাগিয়া পড়িবে না এবং নিজ নিজ শক্তি-সাধ্যের সদ্ব্যবহার করিবে না, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করিলে কোনও কর্ম্মীকেই নিজ নিজ গ্রাম ও সংসার ছাড়িয়া অনেক দূরে দূরে দৌড়াইয়া বেড়াইতে হয় না। একদল লোক বসিয়া বসিয়া হুকুম দিবে, আর একদল লোক জেলাময় কেবল ঘোড়দৌড়ের পালা অভিনয় করিবে, ইহা সংগঠনের সুস্থতার বা সবলতার লক্ষণ নহে।

*　　　*　　　*　　　*

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

১৯০৫, ১৯১০, ১৯১৪ বা ১৯২১ ইংরাজিতে ত্যাগেচ্ছু যুবকদের সংখ্যা দেশে যাহা ছিল, ১৯৭৪এ তাহা নাই। বলিতে কি, অনেক খ্যাতিমান সেবা-প্রতিষ্ঠান এখন ত্যাগবুদ্ধি কর্ম্মীর অভাবে ম্রিয়মান বা মুমূর্ষু-দশায়। তথাপি, অমাবস্যার ঘনান্ধকারে মেঘাবৃত আকাশে

সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেছে না। ইহাতে আমি অস্বস্তি বোধ করিয়াছি। হাজার লোকে কেন এক সঙ্গে কাজে লাগিয়া পড়িবে না এবং নিজ নিজ শক্তি-সাধ্যের সদ্ব্যবহার করিবে না, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। প্রত্যেকেই কিছু কিছু কাজ করিলে কোনও কর্ম্মীকেই নিজ নিজ গ্রাম ও সংসার ছাড়িয়া অনেক দূরে দূরে দৌড়াইয়া বেড়াইতে হয় না। একদল লোক বসিয়া বসিয়া হুকুম দিবে, আর একদল লোক জেলাময় কেবল ঘোড়দৌড়ের পালা অভিনয় করিবে, ইহা সংগঠনের সুস্থতার বা সবলতার লক্ষণ নহে।

* * * *

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

১৯০৫, ১৯১০, ১৯১৪ বা ১৯২১ ইংরাজিতে ত্যাগেচ্ছু যুবকদের সংখ্যা দেশে যাহা ছিল, ১৯৭৪এ তাহা নাই। বলিতে কি, অনেক খ্যাতিমান সেবা-প্রতিষ্ঠান এখন ত্যাগবুদ্ধি কর্ম্মীর অভাবে ম্রিয়মান বা মুমূর্ষু-দশায়। তথাপি, অমাবস্যার ঘনান্ধকারে মেঘাবৃত আকাশে

বিদ্যুৎ-ছটার ন্যায় মাঝে মাঝে যে দুই চারিটী ত্যাগেচ্ছু যুবকের আবেদন আমাদের হাতে আসে, তাহাদিগকেই আমরা আশ্রমে ঠাঁই দিতে সমর্থ হই না শুধু এই জন্য যে, আশ্রমটী ভিক্ষায় বা দানে চলে না, চালাইতে হয় সম্পূর্ণ রূপে স্বাবলম্বনের মহিমায়। কেহ আসিয়া এক বছর বা দুই বছর নিষ্ঠাপূর্ব্বক খাটিয়া গেলে তাহার দ্বারা তাহার অন্নটার ব্যবস্থা কোনও প্রকারে হইয়া যাইতে পারে কিন্তু এত ক্লেশ সহিয়া দুই বৎসর লাগিয়া থাকার ধৈর্য্য কর্ম্মীদের নাই। অকারণে দুই বেলা অন্ন-পরিবেশনের ক্ষমতাও আমাদের নাই।

পুরুষ কর্ম্মীদের নিয়াই যেখানে এই অবস্থা, সেখানে মহিলা-কর্ম্মীরা ত্যাগ-জীবন যাপনে আগ্রহী হইলেও আমরা তাহাদের জন্য সুযোগ-সুবিধা করিয়া দিতে বর্ত্তমান সময়ে পারিতেছি কৈ? এজন্য আরও দীর্ঘকাল আমাদের প্রতীক্ষা করিতে হইবে, মনে হইতেছে।

মনে মনে যে প্রশ্নটী করিতেছিলে, তাহার জবাব ত পাইলে। এখন অন্য প্রশ্নটী সম্পর্কে বলিব।

আমি সাহিত্য-চর্চ্চা করি না, অর্থাৎ নাটক লিখি না, উপন্যাস লিখি না। লিখিবার সময় কোথায়? এসব লেখা শুরু করিলে কথা বলিব কখন, কাজ করিব কখন? যত কাজ করিয়াছি, অধিকাংশই পণ্ডশ্রম, তাহার দশ ভাগের এক ভাগও কথা বলি নাই। যত কথা বলিয়াছি, তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে। তথাপি যে দুই একটা গান লিখিয়াছি, তাহা নেহাৎ দায়ে পড়িয়া লিখিয়াছি, না লিখিলে প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করে, তাই লিখিয়াছি। তোমরা যাহারা আমার জীবন-কর্ম্মে সহায়তা করিবে বলিয়া প্রত্যাশা করা যায়, তাহারা যদি গানের আসরেই দিন কাটাও আর গানগুলি মকস্ করিবার জন্যই

বিপুল শ্রম ও অর্থের অপচয় কর, তবে তাহা নিশ্চয়ই ভুল হইবে। উৎসবের খিচুড়ী-পর্ব্বের ন্যায় সঙ্গীত-পর্ব্বটাকে তোমরা কিছুটা পরিমিতির মধ্যে রাখিবার চেষ্টা করিও। আসল চর্চ্চা ত তোমাদের প্রয়োজন প্রেমের। সেই প্রেম তোমাদের আসিল কিনা, বিবেচ্য ও প্রকৃত প্রস্তাবে মাত্র তাহাই। আমাকে দিয়া যে প্রেম তোমাদের আরম্ভ হইল, তাহা বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িবে, তবে ত তোমাদের সাথে আমার পরিচয়ের ও আত্মীয়তার প্রকৃত মর্য্যাদা রহিল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২২শে মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি যেমন এইখানে বিগত পঁয়তাল্লিশ-ছিয়াল্লিশ বৎসর ধরিয়া কেবল বাধার সহিত সংগ্রাম করিয়া কোনও প্রকারে কাজ আরম্ভ করিয়াছি এবং সম্ভবতঃ প্রতিদিন অধিকতর বাধার সম্মুখীন আমাকে হইতে হইবে, তোমাদিগকেও সেইরূপ নিজ নিজ স্থানে নানা বাধাকে অগ্রাহ্য করিয়া কাজ করিয়া যাইতে হইবে। এক কণা ঈশ্বর-বিশ্বাস আমার অন্তরে ছিল বলিয়াই আমি এতকাল অক্লান্ত বিক্রমে যুদ্ধ করিতে

করিয়াছি। আজও আমি জিতি নাই, তবে হারিও নাই। মৃত্যুকাল পর্যন্ত হাসিতে হাসিতে এই শ্রম করিয়া যাইব, এই পণ করিয়া রাখিয়াছি। এখন তোমরা নিজ নিজ স্থানে কি করিবে? উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহা কাহারও পক্ষেই সঙ্গত বা শুভপ্রদ হইবে না।

পুনরপি স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩ মাঘ, বুধবার, ১৩৮০
(৬ ফেব্রুয়ারী, ৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শ্রীমান্ ম—এক পত্র লিখিয়া আমার নির্দ্দেশ চাহিয়াছে যে, আমার সম্পর্কে নানা স্থানে সে যে সকল অলৌকিক কাহিনী শুনিয়াছে, তাহা প্রচার করিবে কিনা। আমি এই পত্র পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই, কারণ, এই দেশে কেহ কাহাকেও মহৎ বলিয়া মনে করিলে সঙ্গে সঙ্গে কল্পনালোকে প্রবেশ করিয়া নানা অলৌকিক ঘটনার সহিত পরিচিত হয় এবং প্রত্যক্ষ অপেক্ষাও ঐ সকল কল্পিত কাহিনীর প্রতি অধিকতর আস্থা স্থাপন করে। কল্পনাও সত্য জগতেরই একটা অংশ, সুতরাং কল্পনা দোষের নহে। কিন্তু কল্পনার মূল যখন

অলীকে প্রবেশ করে, তখন শাখা-প্রশাখা আর সত্যের আকাশে দাঁড়িতে পারে না, তাহাদিগকে অলীক আকাশ খুঁজিয়া লইতে হয় এবং ইহার পরিণতি ঘটে অলীক ফুলে আর অলীক ফলে। সেই ফল হইতে অলীক বীজের সৃষ্টি হয় এবং সেই বীজের অঙ্কুরোদ্গমও অলীক। এক অলীক শত, সহস্র, লক্ষ অলীকের সৃষ্টি করে এবং অলীকের ইন্দ্রজালের গোলক-ধাঁধায় ঘুরিতে ঘুরিতে শত জন্ম বৃথাই পার হইয়া যায়।

অলৌকিক ঘটনা তোমার, আমার, সকলের জীবনেই কখনো কখনো ঘটে। কাহারো কাহারো জীবনে অত্যধিক সংখ্যায় ঘটে। ইহার কারণ কি, অনুসন্ধানের প্রয়োজন আমি দেখি না। তবে, ইহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু অলৌকিকের মূলধনে জীবনের কারবার চলে না, জীবনের কারবার লৌকিক ব্যাপার নিয়া। এজন্য চলার পথে অলৌকিককে অতিরিক্ত মূল্যদান কখনোই সঙ্গত নহে। তোমরা অলৌকিকের মায়া-মরীচিকায় বিমুগ্ধ হইয়া পথ-বিভ্রান্ত হইও না। আমার জীবন সহজ সরল স্বাভাবিক সত্যের জীবন, এই জীবনে হেঁয়ালীর প্রশ্রয় নাই।

জগতের লৌকিক ব্যাপারগুলিও কম অলৌকিক নহে। যাহা খাই, তাহা হজম হইয়া শোণিতে পরিণত হয়। সকলেরই হয়। সুতরাং ইহা একটা সাধারণ লৌকিক ব্যাপার। কিন্তু কেন হয়? এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে গিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িতে হইবে। শোণিতকণাগুলি শরীরের কোটি কোটি কোষকে খাদ্য যোগায়। ইহা সকলের পক্ষেই সত্য। সুতরাং ইহা লৌকিক। কিন্তু কেন শোণিতকণাগুলি তাহা করে, ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। জীবকোষগুলি

শরীরের প্রত্যেকটী অংশে বিরাজিত কিন্তু একটা নির্দ্দিষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়া গমন করিলে সে আবার কোটি কোটি জীবকোষের আধারস্বরূপ আর একটা নূতন জীবকে সৃষ্টি করে। ইহা প্রত্যেকটী জীবের পক্ষে সত্য। সুতরাং ইহা একটা স্বাভাবিক ও লৌকিক ব্যাপার। কিন্তু কেন একটা জীবকোষ অন্য একটা জীবকে সৃষ্টির পথে আনিয়া দেয়, সেই রহস্য এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। লৌকিকের ভিতরে এই ভাবে অলৌকিক লুকাইয়া আছে। অলৌকিক বলিয়াই কোনো কিছুকে অবিশ্বাস করিবার যুক্তি নাই।

পৃথিবীতে অলৌকিকের প্রতি মানুষের ভক্তি, বিশ্বাস, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয়, সম্ভ্রমবোধ ও বিস্ময় চিরকালই ছিল এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু তার জন্য মানুষের জীবনের, মহিমার, আদর্শের ও অবদানের মূল্যায়নের জন্য অলৌকিককে মাপকাঠি করিয়া ধরিতেই হইবে, একথা আমি স্বীকার করি না।

একজন বহুখ্যাত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সহিত দৈবাৎ আমার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল। ইনি যে একটা তুড়ি দিলে ঘর গোলাপের গন্ধে আর মৃগনাভির গন্ধে আমোদিত হইয়া যায়, ইহাতে জগদ্বাসীর কি লাভ অথবা এই ব্যাপারের সংঘটনকারী মহাপুরুষেরই বা কি লাভ, আমার মনে মনে এই প্রশ্নটা ছিল। আমার সহিত প্রথম দর্শনেই তিনি বলিলেন,—এসব ঘটনা সত্য, কিন্তু ইহার ফলে কারো কোনো শুভ হয় না, যত শুভ সবই সৎকর্ম্মের ফল। তিনি বারংবার বলিতে লাগিলেন,—কর্ম্মেভ্যো নমঃ, কর্ম্মেভ্যো নমঃ, কর্ম্মেভ্যো নমঃ।—মহাপুরুষ নিজে হইতেই আমার মনের মন্তব্যটুকু বলিয়া ফেলায় আমি হৃষ্ট হইলাম, ইহা বলাই বাহুল্য।

কোনও মহাপুরুষ যদি তিন মণ গোময় সেবন করিয়া সাত মণ চন্দন-গোলা বমন করিতে পারেন, কোনো মহাপুরুষ যদি এক পিপা কাসুন্দী খাইয়া তিন পিপা ঝোলা গুড় অধঃপথে নিঃসারিত করিয়া দিতে পারেন, কোনো মহাপুরুষ যদি এক তুড়ি দিয়া একমণ বাগবাজারের রসগোল্লা সাত শত মাইল দূর হইতে শূন্য পথে আনাইয়া ভক্তদের তৃপ্ত করিতে পারেন, কোনো মহাপুরুষ যদি উত্তাল-তরঙ্গাকুল নদীবক্ষের এপার হইতে ওপারে একেবারে পায়ে হাটিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, তবে দৃশ্য হিসাবে উহা যে খুবই উপভোগ্য হইবে, ইহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু ইহা দ্বারা সেই মহাপুরুষের বা তাঁর ভক্তগণের বা জগদ্বাসী জনসাধারণের কি উপকারটা সাধিত হইল, এই প্রশ্ন থাকিয়াই যায়।

লৌকিক চেষ্টায় বারংবার ব্যর্থকাম হইয়া মানুষ শেষে অলৌকিকের দিকে যে ঝুঁকিয়া পড়ে, এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমি বলি কি, ব্যর্থতা যতই আসুক, আমাদের লৌকিক শক্তি-সামর্থ্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের দিকেই মন দিতে হইবে। দৈব কখনো কখনো ব্যক্তি-বিশেষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে কিন্তু একটা জাতির সামগ্রিক ভাগ্য দৈবের ব্যাপার নহে। ম্যাজিক বা ইন্দ্রজালের উপরে ভরসা করিয়া জাতীয় ভাগ্য-নিরূপণের প্রয়াসে নামিলে তাহার ফল কদাচ মঙ্গলময় হয় না। যাঁহারা দেশ ও সমাজের শিক্ষাদাতা বা গুরু হইবেন, তাঁহাদের জীবনে ও উপদেশে এই কথারই প্রাধান্য থাকা উচিত যে, প্রত্যেককে ঈশ্বর-বিশ্বাস রাখিয়া প্রবল পুরুষকারে নির্ভরশীল হইতে হইবে। জাতির ভাগ্য বা দেশের ভবিষ্যৎ একটা লৌকিক ব্যাপার। তাহার মীমাংসা লৌকিক চেষ্টা দ্বারাই করিতে হইবে। ঝাড়ফুক, তুকতাক, গ্রহপূজা প্রভৃতির দ্বারা জাতির ভাগ্য-পরিবর্তন

সম্ভব নহে। ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া পুরুষকার-প্রবুদ্ধ হও, তাহা হইলে প্রতিবেশীর প্রতি ন্যায়বিচারে তুমি কদাচ অক্ষম হইবে না। পুরুষকার-প্রবুদ্ধ হইয়া ঈশ্বর-বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে তোমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের মধ্যে অলৌকিকের ভেজাল ঢুকিয়া তোমার সাধন-পথকে কুসংস্কার-জর্জ্জরিত করিতে পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৩ মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বর্দ্ধমান জেলার কাক্‌শা হইতে শ্রীমান গণেশ চন্দ্র দে ষাটখানা সাবান নিয়া আসিয়া বলিল,—"আমার ছেলের একখানা সাবান প্রয়োজন কিন্তু মালটিভারসিটির ষাট জন ছেলেকেই যদি একখানা করিয়া সাবান না দিতে পারি, তাহা হইলে আমার ছেলের জন্য একা একখানা সাবান দেওয়া চলে না। সুতরাং এই নিন ষাটখানা সাবান।" দৃষ্টান্তটি কি অনুকরণীয় নহে ?

চব্বিশ-পরগণা জেলার এক পিতা তাঁর পুত্রের কাছে এক টিন মুড়ি আনিয়া দিয়া গিয়াছেন। দেখাদেখি অন্য ছেলেরা নিজেদের বাপ-মায়ের কাছে এক এক টিন মুড়ি আনিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন পত্র

লিখিতে লাগিল। এই সব পত্র পাইয়া অনেক পিতামাতাই ছেলের জন্য বড় চিন্তিত হইলেন। তবে কি ছেলেগুলি আশ্রমে আসিয়া না খাইয়া কষ্ট পাইতেছে? কিন্তু মেদিনীপুর জেলার বনপুকুর হইতে এক পিতা তাঁর পুত্রকে লিখিলেন,—"তোমার জন্য এক টিন মুড়ি নিয়া আসিতে হইলে আমাকে ষাটটী ছেলের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য এক টিন মুড়ি আনিতে হয়। কিন্তু তাহা ত' সম্ভাব্য ব্যাপার নহে। সুতরাং সকল ছাত্রদের সহিত সমভাবে ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রাণপণে মানুষ হইবার চেষ্টা কর। মিতাহার ও সংযমের মধ্য দিয়াই প্রকৃত মানুষের জীবন গড়িয়া ওঠে।"—অবশ্য, বলাই বাহুল্য, আশ্রমে ছাত্রদের পেট ভরিয়াই খাইতে দেওয়া হয়। তবে এখানকার জল বড়ই আগের। এজন্য বেশী খাইলেও তাড়াতাড়ি ক্ষুধা পায়। জলের গুণের জন্যই ত এখানে আশ্রম করা, নতুবা এই দেশটাতে আপাততঃ আকর্ষণের আর কিছুই নাই।

উত্তর কাছাড়ের এক পিতা পুপুন্‌কীতে মালটিভারসিটির একটী ছাত্রকে লিখিয়াছেন,— "পরিশ্রম, দক্ষতা, আজ্ঞাবহতা ও সত্যবাদিতার মধ্য দিয়া মানুষ হইবার জন্যই পুপুন্‌কীতে গিয়াছ। একথা কদাচ ভুলিবে না।"

মালটিভারসিটির ছাত্রদের খবর জানিতে চাহিয়াছ বলিয়া সংক্ষেপে এইটুকুই লিখিলাম। তিন মঙ্গলবার তিনটী স্থানে ইহাদের নিয়া গিয়াছি, এবং আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়া সদাদর্শের বীজ-বপনের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু গাড়ীর আগে ঘোড়া না জুড়িয়া ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়াতে অনভিপ্রেত অতিশ্রমের মধ্যে পড়িয়াছি। স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় এই অতিশ্রম সহিবে কিনা, মাঝে মাঝে ভাবিতে

উঠিতেছে। ছাত্রাবাসে স্থান হয় নাই, "অধ্যয়নে" ছাত্রাবাস করিতে হইয়াছে। "গোধনে"র গৃহ-নির্মাণ শেষ হয় নাই, অথচ নিত্য যাহাদের দুধ প্রয়োজন, তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ হইতে ছানা ও উত্তরপ্রদেশ হইতে শুষ্ক ক্ষীর (খোয়া) আসিয়া গব্যের সহিত ছাত্রদের পরিপুষ্টি রক্ষার চেষ্টা চলিতেছে সত্য, কিন্তু তাহা যুগপৎ ব্যয়বহুল এবং অনিশ্চিত। তাই দুই চারিদিন অন্তর অন্তর বিদ্যার্থীদের ডাকিয়া নিয়া গোধন-গৃহের ইট টানাইতেছি। অবশ্য, এক সঙ্গে একখানার বেশী ইট উহাদিগকে ধরিতে দেওয়া হইতেছে না। কয়েক দিন ইহারা হাজারেক ইট সাজাইয়াছে। এই কাজটাই হইতেছে রাজমিস্ত্রীর কাজের প্রথম শিক্ষানবীশি। প্রথম দিনে ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলাম। দ্বিতীয় দিনে ইহাদের হাত আসিয়া গেল। তৃতীয় দিনের কাজে উহাদের ক্ষিপ্রতা ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষ্য করা গিয়াছে। ইহাদের তৈরী ইটে বিরাট ভাগাড়ে যে চুন-বালি মশলা ভিজান হইয়াছিল, অদ্য তাহার দ্বারা গোধনের দেওয়াল গাঁথা হইল। আজ ছেলেরা রাখি-পূর্ণিমার ছুটি চাওয়াতে বিকালে পুরা দুই ঘণ্টা কাল ইট ভিজান, মশলা কাটা, ইট টানা, রাজমিস্ত্রীর হাতে ইট দেওয়া প্রভৃতি কাজ বিপুল আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে করিয়াছে। যে পরিমাণ মশলা তৈরী হইয়াছে, তাহাতে হাজার দশেক ইটের গাঁথুনি চলিবে। আমাদের ইট আশ্রমেই তৈরী করা, পাকা পাঁচ ইঞ্চি দশ ইঞ্চি মাপের বড় ইট। বিশ পঁচিশ দিন পরে এই সকল বাচ্চা বিদ্যার্থীদের কারো কারো হাতে কর্ণি তুলিয়া দিতে পারিব, মনে করিতেছি।

এক একটী ছাত্রের নিকট হইতে পঞ্চাশ টাকা করিয়া মাসিক খোরাকী-ব্যয় বাবদ নিয়াছি। কিন্তু ইহারা মাসে পঁচাত্তর টাকার মাল

প্রতি জনে টানিবে। এখানকার রাক্ষুসে ক্ষুধা ইহাদের আহারের মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছে। আগামী পাঁচ মাস কাল সাহ্লাদে এই অতিরিক্ত ব্যয়টা আমি বহন করিয়া যাইব। আমার প্রত্যাশা, যদি দু-চারটা ছেলেও জীবনের প্রকৃত আদর্শ বুঝিতে পারে। আশ্রম ত স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠের জন্ম দিল। আশ্রমে যে বালকেরা খাটিতেছে, তাহার জন্য তাহারা ঠিক যোগ্য হইয়া ওঠা মাত্রই পারিশ্রমিক পাইবে। আমি পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেলকে পাটনাতে পত্র দিয়াছি যে, পুপুনকী আশ্রম ডাকঘরে প্রত্যেক ছাত্র একটী করিয়া পোষ্টাল-সেভিংস্-ব্যাঙ্ক খুলিবে, তিনি যেন কাগজপত্র পাঠান। ডাক-বিভাগ হইতে উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়া যাইবামাত্র আমি নিজ পকেট হইতে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে পাঁচটী করিয়া টাকা দিয়া একটী করিয়া অ্যাকাউণ্ট খুলিয়া দিব। তারপর হইতেই আশ্রমে প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে যে যাহা যখন পাইবার, তাহা পাইলেই ঐ অ্যাকাউণ্টে জমা দিয়া দিবে। ইহাদের প্রাপ্য যে বিরাট অঙ্কের মুদ্রা হইতে পারে না, একথা বুঝিবার মত বুদ্ধি নিশ্চয়ই তোমার আছে। কিন্তু চারি আনা, পাঁচ আনা, বারো আনা, এক টাকা জমিতে জমিতে একদিন যে সাকল্য অর্থ মোটা অঙ্কের হইতে পারে, তাহা নির্ব্বোধেও বুঝিবে। ইহারাই নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী শ্রম দিয়া আশ্রমটাকে গড়িবে, আশ্রমের আয়প্রদ বিভাগগুলির সৃষ্টি, পুষ্টি ও প্রসারের ব্যবস্থা করিবে,—আশ্রম ইহাদের যোগ্য পারিশ্রমিক দিয়া ইহাদের নিকটে অঋণী থাকিবে। এই আদর্শটা দেশে নাই,—আমি দিতে চাহি। কিন্তু তোমরা ত তেমন ভাবে আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইতেছ না। অথচ আমি একই উদ্দেশ্যে সারা জীবন কঠোর শ্রম করিতে করিতে আজ বৃদ্ধ হইয়া গেলাম। মানুষ অনন্তকাল যে বাঁচে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

প্রায় পঁয়ষট্টিটি ছাত্র ভর্ত্তির অনুমতি পাইয়াছিল। কয়েকজন আসে নাই। কিন্তু যাহারা আসিয়াছিল, তাদের মধ্যে দুজন চলিয়া গিয়াছে তাদের মা পুত্রবিরহে মৃত্যুদশায় পড়িয়াছেন সংবাদে। অপর দুটী দুরন্তপণা প্রভৃতির জন্য ফেরৎ গিয়াছে। আরও একটী এমনই কান্না জুড়িল যে তাহাকে মাসাধিক বুঝাইয়াও রাখা গেল না। এভাবে পাঁচটী ছাত্র কমিয়াছে। আরও দশ জন কমিয়া গেলে ভাল হইত। কিন্তু জোর করিয়া কমাইতে চাহি না।

পিতামাতাদের মধ্যে কেহ কেহ জানিয়া শুনিয়া অত্যন্ত দোষদুষ্ট দুর্ব্বৃত্ত ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। প্রথম গুচ্ছটা আমরা সৎ-স্বভাবের ছেলে চাহিয়াছিলাম। সংশোধনীয় প্রচেষ্টায় আমাদের কত শ্রম আর কত সময় যে দিতে হইতেছে, বলিবার নহে।

সব চাইতে বেশী বিপদ ঘটিয়াছে প্রেসের ঘরটা শেষ করিতে না পারায় এবং সবগুলি প্রিন্টিং মেশিন আসিয়া না পৌছানতে। যে কয়টা মেশিন আসিয়াছে, সে কয়টা দিয়া শিক্ষাদান ও দৈনিক পাঠ্য বিষয় মুদ্রণ চলিতে পারিত কিন্তু ঘরটা শেষ না করিতে পারিয়া বারংবার আফশোষ করিতেছি যে আরও এক বৎসর পিছাইয়া দিয়া তারপরে কেন ছাত্র ভর্ত্তি করিলাম না। পুঁথি-পুস্তক সহজে সংগ্রহ হইতেছে না। অথচ হাজার দেড় দুই টাকা ঐ বাবদে খরচ করিতে হইতেছে। পুরাতন মাশদহের শ্রীমান সুধীর কুমার সাহা স্বরচিত ইংলিশ গ্রামার-কম্পোজিশনস ষাট কপি বিনামূল্যে পাঠাইয়া দিয়াছে। বইখানা ভাল। ছাত্রেরা আগ্রহ করিয়া পড়িতেছে।

এখানকার শিক্ষা-প্রণালীর বিশেষত্ব কি, তাহা দেখিবার জন্য অনেক শিক্ষাবিদ্ এখানে আসিবার অনুমতি চাহিয়া পত্র দিতেছেন।

কিন্তু মুদ্রণ-যন্ত্র চালু হইয়া তিন চারি মাস অতিক্রান্ত হইবার আগে আমি আমার পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত রূপটী দেখাইতে পারিব না। এজন্যই পূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, গাড়ীর আগে ঘোড়া না জুড়িয়া ঘোড়ার আগে গাড়ী জোড়া হইয়াছে। মাত্র ষাট-পঁয়ষট্টি বস্তা সিমেন্টের অভাবে এমন অপ্রস্তুত হইব, একথা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারি নাই। যাহা হউক, চুণের দ্বারা যতটুকু কাজ চলা সম্ভব, তাহা পুপুন্‌কীতে দ্রুত গতিতেই চলিয়াছে। কিন্তু চুণের দ্বারা হয় না।

ছেলেরা প্রথম দিক দিয়া ব্যাডমিণ্টনে আসক্ত ছিল। ফুটবল দেওয়ার পরে ঐ দিকে ঝোঁকটা আরও বাড়িল। এখন আর এই দুইটার একটাও তেমন ভাল লাগে না, জোর কদম চলিতেছে বাঙ্গালীর নিত্যক্রীড়া হাডুডু বা কপাটি খেলার। সন্তরণ ও ধনুর্বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা মাস আড়াই তিন পরে অবস্থা বুঝিয়া শুরু হইতে পারে।

সঙ্গীত-শিক্ষা চলনসই চলিতেছে। আমি শত কর্ম্মে ব্যস্ত ও বিব্রত বলিয়া নিজে মন দিতে পারিতেছি না। সুতরাং এই পত্রে যে আর অধিক সংবাদ পাইবে না, ইহা মনে করিয়াই সান্ত্বনা গ্রহণ কর। পুনরপি স্নেহ ও আশিস নিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৩ মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও

তোমরা কতিপয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিলিয়া প্রাথমিক শিক্ষকগণের মধ্যে এক লক্ষ লোককে প্রণব-মন্ত্রে দীক্ষিত করাইবার সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে সলা-পরামর্শ করিতেছ শুনিয়া চমৎকৃত হইলাম। এই কাজের বাস্তবতা, সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা চিন্তা করিয়া তবে কাজে অবতীর্ণ হইও। চিরকাল আমি তোমাদের দীক্ষামণ্ডপে বসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই বলিয়া আসিতেছি যে, তোমরা তোমাদের গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনীর সংখ্যা-বৃদ্ধিকল্পে কদাচ শক্তির অপচয় করিও না। আজ নানা পরিস্থিতির চাপে পড়িয়া তোমাদের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্কল্পকে অভিনন্দিত করিতে ইচ্ছা হইতেছে । কিন্তু মনে রাখিও, সংখ্যাবৃদ্ধিই শক্তিবৃদ্ধি নহে, ঐক্যবৃদ্ধিই শক্তিবৃদ্ধি, চরিত্রবল-বৃদ্ধিই শক্তিবৃদ্ধি, সংযম ও ত্যাগপরতার বৃদ্ধিই শক্তিবৃদ্ধি, ব্যক্তিগত অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া আদর্শানুগ জীবন যাপনের প্রতিশ্রুতির ও প্রয়াসের মধ্যেই শক্তিবৃদ্ধির প্রধান সর্ত্তগুলি বিদ্যমান।

এক লক্ষ সংখ্যাটী খুবই বড়। এই জন্য প্রথম শুনিতে একটা ত্রাসের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কথাটা খুব সুন্দর, শুনিতে শ্রদ্ধারও উদয় হয়। এক লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক খুঁজিয়া বাহির করিতে এক জেলা বা এক রাজ্য তোমাদের কাজের পক্ষে যথেষ্ট নাও হইতে পারে। সুতরাং এ কাজে নামিতে হইলে আন্তর্জেলা বা আন্তঃরাজ্যিক প্রয়াস চালাইতে হইবে। এজন্য দুই একটা ভিন্ন-প্রদেশীয় ভাষাও শিখিতে হইবে। এজন্য চাই ভিন্ন প্রদেশবাসী ব্যক্তিদের প্রতি অন্তরে গভীর শ্রদ্ধা, অগাধ অনুরাগ ও অপ্রতিম।

বিগত ২৮শে অক্টোবর ১১ কার্ত্তিক রবিবার কাছাড়ের বদরপুরে একটী বিশেষ ভাবে আহূত সম্মেলনের বহু সহস্র গুরুভ্রাতা ও গুরুভগিনী-

দের সম্বন্ধে শ্রীমান্ মহীতোষ তিন ঘণ্টা বিশ মিনিট ব্যাপী যে ভাষণটী দিয়াছিল, তাহাতে ত্রিপুরার অধিবাসী অখণ্ডগণের দ্বারা সৃষ্ট, পুষ্ট ও প্রসারিত এক আন্দোলনের বর্ণনা সে দিয়াছিল। বলাই বাহুল্য যে, নানা ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে পড়িয়া ত্রিপুরার অখণ্ডেরা এমন একটী নূতন আন্দোলনের জন্মদান করিল, যাহা ত্রিপুরাকে জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও রাজ্য-সমূহের মধ্যে অগ্রগণ্য করিয়া তুলিতে চলিয়াছে। মহীতোষের ভাষণ শুনিয়া সমবেত প্রায় ছয় সাত হাজার নরনারীর মনে এক হর্ষ, বিস্ময় এবং অনুচিকীর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর আসামের কোনও জেলার এক নিমন্ত্রিত অতিথি বক্তা প্রকাশ্য সভাতেই মন্তব্য করিলেন,—ইহা অবাস্তব। তাহার প্রতিক্রিয়া এই হইয়াছে যে, কাছাড় নিজ জেলায় লক্ষ অখণ্ডের সৃষ্টি সম্ভব করিবার জন্য এক নূতন আয়োজনে নামিয়াছে আর ত্রিপুরা যে-কাজ আগেই আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, সে কাজে সর্ব্বশক্তি সমর্পণের চেষ্টা করিতেছে। মনে রাখিতে হইবে যে, আর্থিক যোগ্যতায় এবং কর্ম্মিসংখ্যায় ত্রিপুরা অত্যন্ত পশ্চাদ্‌বর্ত্তী কিন্তু উৎসাহের সুপ্রতুলতায় তাহার জুড়ি নাই। আন্দোলন আমি সৃষ্টি করি নাই, ইহারা সৃষ্টি করিয়াছে, অন্য যুগে হইলে আমি বাধা দিতাম, এবার আমি বাধা দেই নাই। কতকগুলি জরুরী কারণে তোমাদের সংখ্যাবলবৃদ্ধি সত্যই একান্ত প্রয়োজনীয়। তবে তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, নিজেদের সংখ্যাবলবৃদ্ধি উদ্দেশ্যে ইহা কখনই নহে যে, কতকগুলি কুসংস্কারের দাসত্ব করিবার জন্য সহযোগ-বুদ্ধির চর্চ্চা করিতে হইবে। এক কথায়, তোমাকে জেলার মানুষ বা রাজ্যের মানুষ না থাকিয়া একটী বিশ্বমানবে পরিণত হইতে হইবে। নিজে যেই ব্যক্তি বিশ্বের মানুষ, সেই ব্যক্তির অধিকার আছে বিশ্বজোড়া

সকলকে নিজের বুকে টানিয়া আনিবার। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিক নীচতা, বংশগত শ্রেষ্ঠতার অহঙ্কার বা নিকৃষ্টতার হীনম্মন্যতা পরিহার করিয়া তবে কাজে নামিতে হইবে। এই আত্মপ্রস্তুতি তোমাদের আছে কিনা, আগে দেখ। তারপরে যদি লক্ষ শিক্ষকের মধ্যে কাজের সাফল্য আপাততঃ সম্ভাব্য বলিয়া জ্ঞান না কর, তাহা হইলে দশ হাজার প্রাথমিক শিক্ষক বা এক হাজার প্রাথমিক শিক্ষককেই লক্ষাধিক বলিয়া গণনা করিয়া পঙক্তিবদ্ধ ভাবে কাজে নামো। কাজটী যে মহৎ, এই জ্ঞান তোমাদের থাকা চাই। কাজটী যে সম্ভব, এই বিশ্বাস তোমাদের থাকা চাই। কাজটীর ফল যে সামগ্রিক জগতের পক্ষে শুভ, এই বিষয়ে তোমাদের কৃতনিশ্চয়তা থাকা চাই। কাজটায় একবার হাত দিয়া আর জয়-পরাজয়ের নানা জটিল আবর্ত্ত দেখিয়াও ছাড়িয়া দিবে না, এই প্রতিজ্ঞা থাকা চাই। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের আমলে আমরা পুলিশের মুখে পদাঘাত করিয়া রাস্তায় রাস্তায় গাহিয়া বেড়াইতাম,—

"নিয়েছ যে ব্রত পালনে বিরত
হয়ো না হয়ো না বঙ্গবাসিগণ,
ব্রত-ভঙ্গ হ'লে হাসিবে সকলে,
দেশের কলঙ্ক ঘোষিবে ভুবন।"

তোমাদিগকেও তেমন অকুতোভয়, নির্লজ্জ ও অধ্যবসায়ী হইয়া কাজে নামিতে হইবে। কাজটী যদি ভাল হয়, তাহা হইলে আর ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ের প্রশ্নে কাহারও কাতর হওয়া উচিত নহে। একপাল বুদ্ধিহীন মেষ-শাবক তোমরা সংগ্রহ করিলেই কাজ হইল না মনে রাখিতে হইবে

৬

যে, দেশের ও দশের সামগ্রিক মঙ্গল-সাধন ব্যতীত কাহারও কল্যাণ নাই। মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যাবৃদ্ধি আভিজাত্যবৃদ্ধি প্রভাববৃদ্ধি প্রভৃতি যে ভাবে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীকে কেবল প্রসারিতপরিধি করিতেছে, তোমাদেরও যদি ভবিষ্যতে তাহা হয়, তবে তোমাদের অভিপ্রায়ের শুদ্ধতা বজায় রহিল না।

ওঙ্কার-মন্ত্র সাম্প্রদায়িক মন্ত্র নহে। ওঙ্কার-মন্ত্র সমন্বয়ের মন্ত্র। এই মন্ত্রে সব মন্ত্র আছে। এই মন্ত্র জপিলে সব ভাষার সব মন্ত্র জপ করা হইয়া যায়। এই মন্ত্রের সহিত কোনও মন্ত্রের বিরোধ নাই। এই মন্ত্র হইতেই সর্ব্বমন্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ। এই মন্ত্রেই সর্ব্বমন্ত্র আসিয়া আত্মনিমজ্জন করে। জগতের যাবতীয় মন্ত্র একসঙ্গে উচ্চারিত হইলে যাহা হয়, এই মন্ত্রটী ঠিক সেই মহাবস্তু। সুতরাং এই মন্ত্রের সাধক-সংখ্যা-বৃদ্ধিতে জগৎ হইতে সাম্প্রদায়িক কলহ কমিবার সম্ভাবনা সুপ্রচুর।

কিন্তু প্রচারকার্য্যে নামিয়া তোমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, নির্লোভতা আর ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত অন্য কোনও যোগ্যতার উপরে নির্ভর করিতে গেলে পরিণামে তোমরা ঠকিবে। চালাকি আর চালবাজি এই পথের সৎ-পাথেয় নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৪ মাঘ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮০

(৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার ক্ষুদ্র কার্ডখানা পাইয়া উল্লসিত হইলাম। ক্ষুদ্র অতটুকু একটা গ্রামের পনেরটি দম্পতী একবৎসরের জন্য পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্যের ব্রত গ্রহণ করিয়াছ জানিয়া আমার আহ্লাদের সীমা নাই। তোমাদের মতন শিষ্যরাই পৃথিবীর নিকটে প্রমাণ রাখিয়া যাইবে যে, আমি কেমন গুরু ছিলাম। সৎসঙ্কল্প নিয়া জেলাব্যাপী কাজ আরম্ভ করিবার প্রাক্কালে তোমাদের এই সংযম-ব্রত গ্রহণ অতীব তাৎপর্য্যপূর্ণ। ব্রহ্মচর্য্য যাহাদের নাই, তাহাদের সঙ্কল্প দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাহারা বারংবার সঙ্কল্পচ্যুত হইয়া পথ হইতে পথান্তরে, মত হইতে মতান্তরে ভ্রমিয়া বেড়ায়। ভ্রান্তি-জালে তাহাদের চরণযুগল বারংবার আটক পড়ে এবং বৃথা শ্রান্তির সহিত আত্ম-অবিশ্বাসকে উৎপাদিত করে। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের সাংবৎসরিক সংযম-ব্রত সফল হউক। তোমাদের ধর্ম্মপ্রাণা সাধ্বী সহধর্ম্মিণীদিগকে আমার অমল আশীর্ব্বাদ ও অতল স্নেহ জানাইও।

কাজের মানুষ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের প্রত্যেককে খুঁজিয়া বাহির করা সংগঠনের প্রথম কাজ। প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত পরিচিত ও যুক্ত করিয়া দেওয়া সংগঠনের দ্বিতীয় কাজ। প্রত্যেকের লক্ষ্য একমুখীন করিয়া দিয়া প্রতিজনকে কর্ম্মতৎপর করিয়া দেওয়া সংগঠনের তৃতীয় কাজ। কর্ম্মযজ্ঞ যখন আলস্যনাশক মহামারী রূপে চতুর্দ্দিকে ধূম-নির্গমন করাইতে থাকিবে, তখন জানিবে যে তোমাদের কাজের কিছু অগ্রগতি হইয়াছে, চূড়ান্ত লক্ষ্যে না পৌছিয়া একজনেও থামিবে না। এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। হয় মৃত্যু, নয় বিজয়, ইহাই তোমাদের পণ হইবে। কাজে নামিয়া থামিয়া যাওয়া, নানা ওজুহাতে কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করা নারকী ও কাপুরুষের কর্ম্ম। কর্ম্ম-কৌশল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য পশ্চাদপসরণ রণ-শাস্ত্রে নিশ্চয়ই একটী অনুমোদিত

প্রথা কিন্তু তোমাদের শাস্ত্র হইতে সেই প্রথাকে অপসারিত করিয়াই চলিতে হইবে। অগ্রগমনই একমাত্র লক্ষ্য হইবে, পশ্চাদপসরণ কদাচ নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৪)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪ মাঘ, ১৩৮০

হরিওঁ

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * * *

ব্যক্তি এবং সংঘ এই দুইটা জিনিষ মহত্ত্বের দিক দিয়া ভয়ঙ্কর ভাবে বিপরীত। ব্যক্তি যেখানে প্রধান, সঙ্ঘ সেখানে জীবন্মৃত। সংঘ যেখানে প্রধান, ব্যক্তি সেখানে অবহেলিত নহেন কিন্তু শৃঙ্খলিত। শৃঙ্খল মানে পরাধীনতার শিকল নহে, কতকগুলি সুনির্দ্ধারিত নিয়মের অধীনতা। সাংঘিক কর্ত্তব্যের মাঝখানে ব্যক্তিগত কলহ, রেষারেষি বা দ্বন্দ্বকে টানিয়া আনা শুধু অসৌজন্যই নহে, অপবিত্রতাও। এই কথাগুলি তোমরা যত অধিক জনে যত স্বচ্ছ রূপে স্মরণ রাখিবে, তোমাদের সঙ্ঘের কুশল তত স্থায়ী এবং সুনিশ্চিত হইবে। কোথাও কলহের আবহাওয়া দেখিলে আমি সযত্নে দেহতঃ এবং মানসিক ভাবে সেখান হইতে শত যোজন দূরে সরিয়া যাই। তোমরা নিজেরা নিজেরা কলহ করিয়া কেবল অন্তর্ঘাতই করিতেছ না, আমাকেও তোমাদের কাছ হইতে দূরে সরাইয়া যে দিতেছ, ইহা তোমরা জান না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
২৪ মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আজ সকালেই তোমাকে একখানা পত্র দিয়াছি। কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি হয় নাই। এজন্য সায়ংকালে পুনরায় লিখিতে বসিলাম। যে খামখানাতে এই পত্রখানা দিতেছি, তাহা দেখিলেই বুঝিবে যে, আমি কত কৃপণ। এক খানা খামকে আমি দুইবার ব্যবহার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি আমার ফেণী থাকাকালে ১৯৪০-৪১ ইংরাজী সাল হইতে। অথচ চিঠি লিখিবার জন্য প্রতি বৎসর আমার কম পক্ষে বিশ রীম কাগজের প্রয়োজন পড়ে। এত কাগজ যে বেপরোয়া হইয়া খরচ করে, তার অধিকাংশ গান রচিত হইয়াছে তোমাদের লেখা যে খামগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিব বলিয়া মনে করি, তাহার বিপরীত সাদা পৃষ্ঠাতে। বেহিসাবী বেপরোয়া অমিতব্যয়িতার সহিত এই কৃপণতা এক সঙ্গে চলিতে পারে না, অথচ এই বৈপরীত্যই যেন আমার একটা বিশেষত্ব। কোনও সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে আমি কৃপণ হই, অর্থটুকুকে বা সময়টুকুকে বৃথা ব্যয়িত হইতে দেই না। কিন্তু যেখানে ব্যাপক কোনও কর্ম্মের কথা আসে, সেখানে আমার সব ব্যাপার একেবারে ঢালাও অমিতব্যয়িতা ও বেহিসাবী কারবার। পুপুন্কী আশ্রম কি হইত, যদি আমি বেহিসাবী মানুষ না হইতাম? মঙ্গলসাগর কি হইত, যদি আমি বেপরোয়া না হইতাম? পুপুন্কী আশ্রমে তেলের কলের কারখানার ব্যাপারটীও তাই। হিসাব করিয়া

একাজে নামি নাই, নামিয়া পড়িয়াছি বলিয়াই এখন হিসাব করিতে হইতেছে। স্বস্তিক অয়েল-মিলের বৈদ্যনাথ আগরওয়ালা বলিলেন, এখনি মিল চালু করিলে সরিষা হইতে উৎকৃষ্ট বা অধিক তেল পাইবেন না, দেরী করিয়া করুন। তিনি পাকা ব্যবসায়ী ও হিসাবী লোক। তাই তাঁর কথাটা মানিয়া লইলাম। তুমি ত অয়েল-মিলের ব্যাপারে করিৎকর্ম্মা অভিজ্ঞ লোক, অনেক হারজিতের মধ্য দিয়া যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছ। এখন তুমি যদি অন্যান্য পরামর্শ দাও, তবে তাহাও মানিয়া লইব। অয়েল-মিলটী না চালু হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যার্থীদের জন্য প্রচুর আবশ্যকীয় তেলের যোগান দিতে পারিতেছি না। জানই ত' বাঙ্গালীর তেলেজলে শরীর। অয়েল-মিল না হইলে প্রচুর তৈল পাইতেছি না। অথচ আমার বিদ্যার্থীদের জন্য দুগ্ধ প্রয়োজন। গাভী না পালিলে প্রচুর দুগ্ধ দেই কোথা হইতে? তেলের মিল চালু হইলে সঙ্গে সঙ্গে আটার চাকি এবং ডালের কলও চলিবে। যাবতীয় মেশিনারী মজুদ করিয়া যার যার স্থানে বসান হইয়া গিয়াছে। এমনকি মোটরটিও যথাস্থানে বসাইয়া পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং ব্যাকুল প্রতীক্ষার দিন কাটাইতেছি যে, ঠিক ৯ই বৈশাখ তেলকল চালু করিতে পারি কিনা। টাকারও প্রচুর আবশ্যকতা, কিন্তু তাহা ভগবান দেখিবেন। শুনিতেছি, প্রতি সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ-হাজার টাকার সরিষার বীজই লাগিবে। আরও কত কিছু লাগিবে, তাহার পূর্ণ ধারণাও আমার এখন পর্য্যন্ত হয় নাই।

এমনই একটী মুহূর্ত্তে একজন প্রতিপত্তিশালী মিল-মালিক হইয়াও তুমি নিজে আসিয়া চারি পাঁচ দিন থাকিয়া আশ্রমের অয়েল-মিল চালু করিয়া দিবে শুনিয়া আমি আনন্দে অধীর হইয়াছি। বাঁকুড়া আত্তে

আস্তে নানা কৃতিত্বের দরুণ আমার নিকটে প্রিয় হইতে প্রিয়তর হইতেছে,— সেই বাঁকুড়ায় তুমি গৌরব বাড়াইলে। আমি সানন্দে তোমাকে আশ্রমের তেলকল উদ্বোধনের ব্যাপারে আমন্ত্রণ করিতেছি।

প্রাতে যে দুই চারিটি কথা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে মন তৃপ্ত হয় নাই বলিয়া একটু বেশী কাগজ, কলম, কালী ও সময় ব্যয় করিয়া এই দীর্ঘ পত্রখানা লিখিলাম। আশা করি, আমার এই পত্র তোমাকে আনন্দই দিবে। জগৎকল্যাণকর্ম্মে সহযোগ ও সহায়তা করিয়া জীবনে ধন্য হও, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪ মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। আশা করি এতদিনে তুমি সুস্থ হইয়াছ। শুনিলাম, ইতিমধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলে। নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশে যদি কিছু জানিয়া, বুঝিয়া, শিখিয়া আসিয়া থাক, তবে তাহার বিবরণ আমাকে দিও। স্বাধীনতার প্রথম ফল নিঃশঙ্কে অবস্থান, দ্বিতীয় ফল দেশবাসীমাত্রের প্রতি প্রেমপূর্ণ মনোভাব, তৃতীয় ফল ভবিষ্যতের প্রতি অবিচলিত আস্থা। এইগুলি ভারতে ঘটিয়াছে কিনা তাহা তুমিও জান, আমিও জানি। নূতন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের এই অমৃতময় ফলগুলি আস্বাদন করিতেছে কিনা জানিবার জন্য ব্যগ্র রহিলাম।

এখন তোমার জেলার কথায় আসি। নগাঁও জেলা হইতে কৃষ্ণকান্ত বদরপুরে গিয়া ত্রিপুরার কর্ম্মকাণ্ডের ইতিবৃত্ত শুনিয়া রোমাঞ্চিত-তনু নিয়া গৃহে ফিরিয়াছে। সে এই বিশ্বাস নিয়া আসিয়াছে যে, ত্রিপুরা যাহা ভাবিতেছে, তাহা করিবে সুনিশ্চিত আর ত্রিপুরার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কাছাড়ও তুমুল কর্ম্মোদ্যমে নামিয়া পড়িবে। তাহার এই আশাবাদ তাহাকে কর্ম্মীত্বের প্রকৃত যোগ্যতা দান করিয়াছে বলিয়াই সে সংসারের হাজার কাজ তুচ্ছ করিয়া জেলার নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু একজন মাত্র লোক খাটিয়া মরিবে, অন্যেরা হয় করিবে সমালোচনা নতুবা দিবে হাততালি, এভাবে জেলার সংগঠন হয় না। জেলার ছোটবড় প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে তোমরা কাজে নামিতে বাধ্য কর। স্বাস্থ্যের জন্য তুমি নিজে কর্ম্মক্ষেত্রে ছুটাছুটি করিতে পার না বা অন্য কেহ জরুরী কাজের জন্য সময় দিতে পারে না বলিয়াই ত বিরাট কর্ম্মশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপরে ভরসা না করিয়া অল্প সামান্য-শক্তি-সম্পন্ন ইচ্ছুক ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করা প্রয়োজন। প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার ফলে উদ্‌ভূত দাঙ্গায় তোমাদের ক্ষতি হইয়াছে, ইহা জানি। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক হাওয়ার জন্য তোমাদের মনে নিশ্চয়তা নাই, ইহাও জানি। তোমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কেহই তোমরা নিঃশঙ্ক নহ, ইহাও জানি। কিন্তু একমাত্র এই কারণগুলির জন্যই এত কাল তোমাদের অঞ্চলে স্থায়ী কাজ কিছুই হয় নাই, ইহা মানি না। গুরুতর প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও মানুষের বিবাহ হইতেছে, সম্পত্তি খরিদ চলিতেছে, শ্রাদ্ধ হইতেছে, মামলা-মোকদ্দমার তদ্বির চলিতেছে, তীর্থভ্রমণ চলিতেছে, রং-তামাসা, খেলা, সিনেমা, যাত্রা, থিয়েটার দেখা চলিতেছে, চলিবে

না কেবল বিশ্বকল্যাণকর সংগঠন ? তাহা চলিবে এবং চালাইতে হইবে। এই প্রয়োজনের দাবী মিটাইবার জন্য প্রত্যেক বড়রা আগে ছোট হইয়া যাও এবং ছোটদের সঙ্গে মিলিয়া তাহাদিগকে সাম্যের মহিমায় কর্ম্মব্রতী করিতে চেষ্টা কর। নিষ্কাম প্রয়াস কদাপি ব্যর্থ হয় না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৪ মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। আমি যখন তোমাদের নিকটে পত্র লিখি, অধিকাংশ সময়েই একথা তোমরা ধরিয়া নিও যে, সেই পত্র কেবল তোমার একার জন্য লিখি নাই, লিখিয়াছি তোমাদের সকলের জন্য। ব্যক্তি-বিশেষের জন্য আমার শ্রম ও পরমায়ু নহে, তাহা সকল ব্যক্তির জন্য। আমি যখন তোমাদের একজনকে আশীর্ব্বাদ করি, জানিও, সেই আশীর্ব্বাদ সকলেরই জন্য বর্ষিত হইতেছে। তোমরা সকলে সকলকে লইয়া জগতে উন্নতি লাভ কর, আমি ইহাই চাহি এবং প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ছাড়া অন্যতর কোনও কামনা আমার অন্তরে স্থান পায় না। সকলে সকলের জন্য বাঁচো, সকলে সকলের জন্য শ্রম কর, ত্যাগ-স্বীকার কর, সকলে সকলের কুশলার্থে অবহেলে জীবন-বিসর্জ্জন কর,—ইহার চেয়ে বড় কামনা আমার আর কিছু নাই।

তোমরা সম্ভবমত প্রত্যেক স্থানে একটী করিয়া অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত করিয়া নিজেদের মধ্যে এবং সর্ব্বসাধারণের সহিত অবিমিশ্র প্রেম-সূচক ও সম্প্রীতিপরিণামী মিলনের সম্ভাবনা-সমূহ সৃষ্টি কর। মণ্ডলীর ভিতরে ও বাহিরে সকলের সহিত সৌহৃদ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের মণ্ডলী তোমাদের ঐক্যের পরিবর্দ্ধক হউক এবং মণ্ডলীর বাহিরের লোকদের সহিত সৌভ্রাত্র্য সৃষ্টির সহায়ক হউক। ঐক্যবলে বলীয়ান হইয়া তোমরা জগতে অসাধ্য সমূহ সাধিত কর এবং ত্রিলোকবাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিকে করতলগত কর। তোমাদের নিজেদের মধ্যেকার ঐক্য তোমাদিগকে বাহিরের লোকদের সহিত প্রীতি, ভালবাসা, সৌহৃদ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক রচনা করিয়া নিবার যোগ্যতা প্রদান করুক। ঐক্য তোমাদিগকে বলদর্পিত না করিয়া মহত্ত্বে বিভূষিত করুক এবং তোমাদের মহত্ত্ব দেখিয়া জগদ্বাসী বিস্ময়ে এবং শ্রদ্ধায় অভিভূত হউক।

কাছাড় জেলার কিছু কর্ম্মী কতকদিন শ্রম করিয়াছিল নিত্য নূতন স্থানে একটী করিয়া মণ্ডলী গঠিত করিবার জন্য। পরবর্ত্তী সময়ে সেই প্রয়াস পেপার-ওয়ার্ক বা কাগুজে বিবরণে পরিণত হয়। কিন্তু একদা যে কতকগুলি মণ্ডলী সত্যই গঠিত হইয়াছিল এবং কোনটা দুই বৎসর কোনটা দশ বৎসর যে বাঁচিয়া রহিয়াছিল, তাহারই দৌলতে জেলার ভিতরে এমন একটা প্রচ্ছন্ন প্রাণশক্তির সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা বিগত বদরপুর সম্মেলনে মহীতোষের ভাষণের পরে এক নব-উদ্দীপনায় হঠাৎ জাগিয়া ওঠে। করিমগঞ্জ মহকুমার কতকগুলি অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সেই প্রাণশক্তি যেন উচ্ছল উদ্বেলতায় এক অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিতে চলিয়াছে। একদা জেলার নানা স্থানে মণ্ডলী স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়াই আজ সমগ্র জেলার ভিতরে আস্তে আস্তে বিপুল

এক নব আন্দোলন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে বলিয়া অনেক দূরদর্শী কর্ম্মী অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সকলের মুখে একটী মাত্র ধ্বনি,—"অখণ্ড-মণ্ডলীর জয় হউক।"

ত্রিপুরাও নূতন নূতন স্থানে মণ্ডলী গঠনের চেষ্টা অনেক কাল ধরিয়া করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে পেপার-ওয়ার্ক বা কাগজে বিবরণ লিখিবার লোক ছিল না। সে যোগ্যতা সকলের থাকে না। তাই বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে যোগাযোগের সূত্র ছিল অতীব ক্ষীণ এবং বিশীর্ণ। কিন্তু একটী দুইটী নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মীর অন্তরে ছিল কুণ্ঠাহীন আনুগত্য আর অপরাজেয় নিষ্ঠা। কতকগুলি মণ্ডলী যে একদা সৃষ্ট হইয়াছিল, এই সরল সত্যকে ভিত্তি করিয়া তাহারা কর্ম্ম-যজ্ঞের এমন আয়োজন করিয়াছে, যাহাকে অশ্বমেধ বা রাজসূয় যে-কোনও নামে ডাকিতে পার। এখানেও সকলের মুখে ধ্বনি উঠিতেছে,—"অখণ্ডমণ্ডলীর জয় হউক।"

বাঁকুড়া জেলায় একজন পোষ্টমাষ্টার সুধাংশু মুখার্জ্জি নিরন্তর বদলীর হিড়িকে পড়িয়া যখন যেখানে গিয়াছে, সেখানেই একটা করিয়া মণ্ডলী স্থাপন করা যায় কিনা, তাহার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে। আজ সেই বাঁকুড়া জেলার কর্ম্মীরা কৌলীন্যের দিক দিয়া অতীব উচ্চ স্তরে উঠিয়া গিয়াছে। তাহাদের নিষ্ঠা, ভক্তি, ত্যাগ ও আদর্শ-পরায়ণতা দিকে দিকে প্রশংসিত হইতেছে। এখানেও দিকে দিকে শুনা যাইতেছে,—"অখণ্ডমণ্ডলীর জয় হউক।"

(১) যে-কোনও প্রকারে তোমাদের জেলার মধ্যে যদি একবার দশ, বিশ, পঁচিশ বা পঞ্চাশটী অখণ্ডমণ্ডলী গঠন করিতে পার, (২) যে-কোনও প্রকারে যদি সেই মণ্ডলীগুলিকে মাত্র পাঁচটী বৎসরের সুস্থ

পরমায়ু দান করিতে পার, (৩) যে-কোনও প্রকারে যদি নিজেদের মধ্য হইতে আত্মকলহের পাপকে নির্ব্বাসন দিতে পার, (৪) যে-কোনও প্রকারে যদি বিশ-পঁচিশ-ত্রিশটী সর্ব্বজনীন অনুষ্ঠানকে এমন অসাম্প্রদায়িক মর্য্যাদায় পরিচালিত করিতে পার, যাহাতে যে-কোনও সম্প্রদায়ের লোক তোমাদের সভ্যশীলতা, সদাচার, ঐক্যবদ্ধতা, শৃঙ্খলা ও নির্বিদ্বেষ-বুদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হয়, তাহা হইলে জানিও, এই জেলাকে জয় করিতে তোমাদের বেশী বিলম্ব লাগিবে না। তোমাদের জয় কাহাকেও পদানত করার মধ্যে নহে, তোমাদের জয় প্রেমের জয়।

আমি যখন তোমাদিগকে অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিতে বলি, তখন প্রকৃত প্রস্তাবে আমি বিশ্বপ্রেমেরই ভিত্তি স্থাপন করিতে বলি। আমার ব্যক্তিপ্রেম সমগ্র সমাজের প্রতি প্রেম হইতে উদ্ভূত, আমার সমাজ-প্রেম দেশপ্রেম হইতে সঞ্জাত, আমার স্বাদেশিকতা বিশ্বৈকাত্মতাবোধ হইতে উৎসারিত। আমি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়া জীবনে একটী দিনের জন্যও ব্যক্তি, দেশ বা জগৎকে দেখি নাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭শে মাঘ, রবিবার ১৩৮০
(১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পরস্পরের মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে যে মতভেদ রহিয়াছে, তাহা অবিলম্বে দূর করিয়া ফেল। দশ জনের সহিত একত্র কাজ করিতে গেলে কোনো কোনো বিষয়ে নিজের মতের প্রাধান্য-হ্রাস স্বীকার করিয়া নিতে হয়। তোমাকে বিবেক বিসর্জ্জন দিয়া কাহারও কাছে নতি স্বীকার করিতে বলিতেছি না, কিন্তু দলবদ্ধ ভাবে কাজ করিতে হইলে প্রত্যেকটী ব্যক্তির প্রত্যেকটী অভিরুচি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। উদ্দেশ্য যদি তোমাদের সৎ হয় এবং গৃহীত উপায় যদি অসৎ না হয়, তাহা হইলে নিজেদের মতামতের যৎসামান্য পার্থক্যকে অবলম্বন করিয়া দূরত্ব রচনা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

প্রাচীন যুগের ঋষিরা একক চেষ্টায় অনেক বৃহৎ কার্য সম্পাদন করিতেন, একথা মিথ্যা নহে। এ যুগে একাকী মহৎ কার্য্য সম্পাদন সম্ভব হইলেও বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন সম্ভব নহে। এ যুগে সঙ্ঘ-শক্তিরই জয়-জয়কার। তোমরা পথ খুঁজিয়া বাহির কর যে, কি করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পার এবং সঙ্ঘশক্তিকে বিকশিত, বিপুলায়িত ও মহিমান্বিত করিতে পার। একা একা কাজ না করিয়া বিরাট কাজকে যোগ্য ভাবে ভাগ ভাগ করিয়া নিয়া যুগপৎ বহুজনে বহুস্থানে থাকিয়াই একক লক্ষ্যে সম্পাদন করিবার সাধনায় সিদ্ধি অর্জ্জনে চেষ্টা কর। একক ভাবে করিতে গেলে যে কাজ নিতান্তই দুরূহ, বহুজনের বিন্যস্ত হস্তের স্পর্শ পাইলে সে কাজ হইয়া পড়ে সহজে সুসম্পন্ন। কদাচ বিস্মৃত হইও না যে, জগতের মহত্তম আদর্শের তোমরা বাহক হইয়াছ। শ্রীভগবানের অপার করুণায় যে শ্রেষ্ঠ আদর্শ তোমরা জীবনে গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সেই আদর্শকে জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কাজে আমার প্রতিটি সন্তান অগ্রণী হও। তোমরা প্রত্যেকে কাজে নামো।

কিন্তু কি সেই কাজ? সেই কাজ, প্রতি গ্রামে একটী করিয়া অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন। সেই কাজ; প্রতিটি মণ্ডলীতে একতা ও সৌভ্রাত্রের চর্চ্চা করা। সেই কাজ, মণ্ডলীর বহির্ভূত জনসাধারণের সহিত প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত ও সম্প্রসারিত করা। সেই কাজ, সমগ্র বিশ্বের কুশলের দিকে তাকাইয়া জীবনের প্রতিটি ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য পালন করা এবং নিজ ব্যক্তিসত্তাকে সর্ব্বজনের শুভসাধনে নিয়োজিত করা। এ কাজ কি তোমরা করিতে পারিবে না?

ছলে নহে, বলে নহে, কূটকৌশলে নহে, প্রতারণা দ্বারা নহে, পরন্তু সদুপায়ের মাধ্যমে তোমাদিগকে প্রতিটি কার্য্য করিবার অভ্যাস আয়ত্ত করিতে হইবে। দেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সৎলোকের আজ বাঁচিবার উপায় নাই। মন্ত্রী, এম-এল-এ, এম-পি হইতে সুরু করিয়া রাস্তার ভিখারী পর্য্যন্ত সকলের চরিত্রের মান একই নিম্নস্তরে আসিয়া নামিয়া পড়িয়াছে। এমন সর্ব্বনাশা নৈতিক অধঃপতন ভারতবর্ষে অতীতে আর কখনো আসে নাই। তথাপি, ইহার মধ্যেই তোমাদিগকে পণ করিয়া চলিতে হইবে যে, যাহা কিছু করিবে, পাপ, অসততা, অসাধুতা, অসত্য ও প্রবঞ্চনা বর্জ্জন করিয়াই করিতে হইবে। তোমাদের এই শুভ সঙ্কল্পের কথা তোমরা মুখে প্রচার করিয়া বেড়াইবার চাইতে কাজে দেখাইবার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হও। একজনের পক্ষে যে সত্য রক্ষা করা সুকঠিন, বহু জনের বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্প একত্র হইলে তাহা হয়ত সহজে সুসিদ্ধ হইবে। আদর্শকে নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজনে বাহিরের লোককে যতটুকু কথা শুনাইবার প্রয়োজন, মাত্র ততটুকুই শুনাও। তোমাদের আদর্শ এবং তোমাদের সঙ্কল্প যখন মহৎ, তখন ইহার বিষয়ে প্রচারণা করা দোষাবহ নহে, বরং প্রচারের

ফলে অনেক অজানিত অঞ্চল হইতে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বান্ধবেরা আত্মপ্রকাশ করিয়া তোমাদের বাইচের নৌকায় দাঁড় টানিতে আসিতে পারেন।

ছাত্র ও যুব-সমাজ আজ নানা প্রকারের মতবাদে বিভ্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মতন অর্থহীন নানা আন্দোলনে জীবন, যৌবন ও সুযোগকে অপচয়িত করিতেছে দেখিয়া তোমাদের ঘাবড়াইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। ইহাদের মধ্যেই তোমাদের বেশী কাজ করিতে হইবে। আগ্রহী-অনাগ্রহীর বিচার না করিয়া যত জনকে পার, পরিপূর্ণ জীবনের সুবিকশিত মহিমার জয় গান ইহাদের প্রতিজনের কর্ণে প্রবেশ করাও। একদল হয়ত টিটকারী দিবে, আর একদল হয়ত হাসিয়া লুটাপুটি খাইবে, অন্য দল হয়ত লাঠিপেটা করিয়া ছাড়িবে,—সব সহিয়া যাও কিন্তু হাল ছাড়িও না। একদা কোথাও না কোথাও কেহ না কেহ প্রাণ-কানুয়ার মোহন-বংশী নিশ্চয়ই শুনিতে পাইবে। জানিও, সে তোমার একান্তই আপনার জন, সে তোমার অন্তরের অন্তরতম প্রাণের মানুষ। তার খোঁজেই তোমাকে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে হইবে পথভোলা বাউলের মত একতারা হাতে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩১)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৭ মাঘ, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমার সমগ্র জীবন জগতের মঙ্গল চিন্তায় বিভোর রহিয়াছে। প্রতিটি কর্ম্ম জগতের কল্যাণকল্পেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। আমার প্রতিটি নিঃশ্বাস প্রতিটি প্রশ্বাস জগতের কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষা নিয়াই নির্গত হইতেছে। দীক্ষাসূত্রে তোমরা আমার কাছ হইতে নিখিল ভুবনের কল্যাণ করিবারই সাধনা পাইয়াছ, পাইয়াছ প্রেরণা। জগতের প্রতিটি মানুষ যদি অপরের কল্যাণ করিবার চিন্তা করে, কাজ করে, তবে স্বার্থমগ্ন পৃথিবীর বুকে কি পরার্থপরতার দিব্যধাম রচনা করা যায় না? যায় এবং তাহাই করিবার জন্য আমরা প্রাণপাত করিতেছি। তাহাই করিবার জন্য তোমাদিগকে ইতঃপূর্ব্বে অনাস্বাদিত অভিনব অখণ্ড-সাধন প্রদান করিয়াছি। এ সাধনার মর্য্যাদা তোমাদের রাখিতে হইবে। পৃথিবীর মধ্য হইতে কলুষ-কালিমা দূর করিয়া দিবার সঙ্কল্প তোমরা গ্রহণ করিয়াছ। জগতের বুকে ভগবৎ-প্রেমের, মানব-প্রীতির, পবিত্র-জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়া তোমরা অখণ্ড-দীক্ষার কৌলীন্য রক্ষায় অগ্রসর হও। একক মুক্তি তোমাদের লক্ষ্য নহে, সকলের মুক্তিই তোমাদের আদর্শ। আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য প্রতিজনের সংঘবদ্ধ প্রয়াস চাই। সংঘবদ্ধ চেষ্টার ফল আসে দ্রুত এবং আসে ব্যাপক পরিণতি নিয়া।

যেখানে তোমার যে গুরুভাই বা গুরুবোনের সহিত সাক্ষাৎ হয় বা পরিচয় হয়, সেখানেই ইহা নিয়াই হউক তোমাদের মধ্যে আলোচনা, প্রত্যালোচনা, অনুসন্ধান ও গবেষণা যে, তোমাদের জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন-সমূহ মিটাইবার তাগিদে যে সকল পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে তোমরা অবশ্য-বাধ্য, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে জগৎকল্যাণৈষণা, জগৎকল্যাণ-ভাবনা, জগৎকল্যাণকর্ম্মচেষ্টাকে কি করিয়া অগ্রসর করিয়া দেওয়া

যায়। একজনেও বসিয়া থাকিবে না, একজনেও ইহাতে অবহেলা করিবে না, প্রত্যেকে নিজ নিজ আগ্রহে কোনও না কোনও কাজে লাগিয়া পড় এবং অন্যান্যকেও লাগিতে প্রেরণা দাও, বাধ্য কর। বিচার করিও না যে, তোমাদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট, কে ধনী আর কে নির্ধন, কে বিদ্বান্ আর কে মূর্খ। কর্ত্তব্য তোমাদের প্রত্যেকের দুয়ারে আসিয়া কড়া নাড়িতেছে, দ্রুত দুয়ার খুলিয়া দাও, কাজে নামিয়া পড়। পরিকল্পনাহীন আন্দাজী কাজ অধিকাংশ সময়ে কঠকর্ম্মে পরিণত হয়। সুতরাং পাঁচ জনে বসিয়া আগে তোমাদের স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী একটী পরিকল্পনা করিয়া নাও, যাহার আংশিক পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন কাজ করিতে করিতে অভিজ্ঞতা ও পটুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করিয়া নিতে পারিবে। তোমাদের কাজ যে তোমাদেরই ভবিষ্যৎকে গড়িতেছে, এই বিষয়ে সুদৃঢ়বিশ্বাসী হইও। নিজেকে অন্যান্য কর্ম্মীদের কাছ হইতে দূরে রাখিয়া, পৃথক্ রাখিয়া একা একা কাজ করিবার জেদ বা মনোবৃত্তি পোষণ করিবে না। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, পরস্পর পরস্পরের পৃষ্ঠ-পোষণ করিয়া, একে অন্যকে যোগ্য সহযোগিতা দিয়া সুশৃঙ্খল প্রয়াসে কাজ করিয়া যাইবে, এই সঙ্কল্পটীকে মনের মনে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিজনে অন্তরে পোষণ করিও সেবকের মনোভঙ্গী, অনুশীলন করিও সেবকোচিত মনোভাবের, কর্ত্তৃত্বস্পৃহা বা অহঙ্কারকে কেহ আবাদ করিয়া বাড়াইয়া দিও না। একটু অহং প্রত্যেকের অন্তরেই সুপ্ত ভাবে থাকে, যাহার নামান্তর আত্মবিশ্বাস বা আত্মশ্রদ্ধা। এই জিনিষটী খুবই ভাল এবং ইহা না থাকিলে কেহ দীর্ঘকাল দুরন্ত শ্রম করিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু আমি নেতা বা আমিই যোগ্যতম নেতা, আমারই নির্দ্দেশে

৭

সকলকে চলিতে হইবে, যে চলিবে না, সে নিতান্ত অভাজন ও অপাত্র, আমারই হুকুমে সকল কর্ম্মপরিকল্পনা তৈয়ী হইবে, গৃহীত হইবে বা পরিত্যক্ত হইবে, আমার ব্যবস্থা-করা শৃঙ্খলা-মত প্রত্যেককে উঠিতে হইবে, বসিতে হইবে, নতুবা আমি রাগ করিব, গালি দিব, অপরের মানহানিকর কটূক্তি করিব, আমাকেই প্রতি বৎসর সভাপতি বা সম্পাদক রাখিতে হইবে, অন্য কোনও নূতন কর্ম্মীকে এই পদ গ্রহণ করিয়া যোগ্যতা সঞ্চয়ের বা যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ দেওয়া হইবে না,—ইত্যাদি ব্যাপার-মূলক কর্ত্তৃত্ব আমাদের দেশের প্রায় প্রত্যেকটী সেবা-প্রতিষ্ঠানকে ডালে মূলে উপড়াইয়া শেষ করিয়া দিতেছে। অহঙ্কারের এই বিকট বিজ্ঞ্রুণ হইতে তোমরা শত যোজন দূরে থাকিতে চেষ্টা করিও।

যদি মণ্ডলী গড়িয়া থাক, তবে তোমাদের স্থানীয় মণ্ডলীকে শক্তিশালী করিবার দিকে প্রত্যেকে তীব্র লক্ষ্য দাও। তোমাদের এখন চতুর্দ্দিকে কর্ম্মধারা সুবিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন। কর্ম্মের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যে একটা বড় কথা, একথা কেহ ভুলিও না। একবার কাজ করিয়াই ঝিমাইয়া পড়ার মতন মূর্খতা আর কিছু নাই। জমিতে একবার মাত্র হলকর্ষণ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে আগাছা জন্মে, সুতরাং প্রথম চাষের পরে দ্বিতীয় চাষ, তৃতীয় চাষ, চতুর্থ চাষ চালাইয়াই যাইতে হইবে এবং যতদিন বীজবপন-কার্য্য সমাধা না হইয়াছে, ততদিন হলকর্ষণে বিরাম দেওয়া চলিবে না। একথা খ্রীষ্টান মিশনরী-ফাদাররা জানেন। এই জন্যই যেখানে এক শত বৎসর পরে যীশুখ্রীষ্টের অমিয়বাণী পরিগৃহীত হইবার প্রয়োজন আছে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন, সেখানে একশত বৎসর

পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা নানা কর্ম্মকাণ্ডের সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের চরিত্রবল, ধনবল প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়াছে ধৈর্য্যবল ও ধারাবাহিকতার বল। তাঁহাদের চরিত্র হইতে এই জিনিষটী তোমরা গ্রহণ কেন করিবে না? অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকারীদের মধ্যে অনেকে অল্প মূল্যে হাট-বাজারের সওদা কিনিতে চাহে বলিয়া তাহাদের প্রতি চেষ্টার মধ্যে হঠকারিতা থাকে। ইহার যে কুফল থাকিতে পারে, তাহা তাহারা চিন্তা করে না। খ্রীষ্টান মিশনরী মহোদয়েরা যদি একটী কাজ করিতেন, অর্থাৎ যদি তাঁহারা ভারতীয় ঋষি-জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়া প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটীরবাসী হইতেন, বিদেশী আড়ম্বরপূর্ণ আভিজাত্যসূচক পোষাক পরিহার করিয়া ভারতীয় যতীর বেশ অনুকরণ করিতেন এবং জন-দি-ব্যাপ্টিষ্ট বা স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টের ন্যায় নগ্নপদে পথ পর্য্যটন করিয়া দেশের পর দেশ পরিভ্রমণ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের স্বাভাবিক ধৈর্য্যবলে ও স্বাভাবিক ধারাবাহিক কর্ম্মানুরাগের প্রভাবে ভারতের অধিকাংশ নরনারীকে যীশুখ্রীষ্টের প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিতেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপে কথাটা তোমাদের কাছে বলিলাম। এই জন্যই বলিতেছি যে, এক স্থানে একবার একটা অনুষ্ঠান করিয়াই রিপ্-ভ্যান-উইঙ্কলের মত বা রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের মত দীর্ঘ ঘুমের ঘোরে ঢলিয়া পড়িলে চলিবে না। নিরন্তর সমপ্রযত্নে, সম উদ্দীপনায়, সম আগ্রহে কাজ চালাইয়া যাইতে হইবে। একই ব্যক্তির বা ব্যক্তিষ্বয়ের পক্ষে স্বল্পকাল-ব্যবধানে বারংবার কাজ চালাইয়া যাওয়ার অসুবিধা হইতে পারে, কারণ প্রত্যেকেরই জঠরজ্বালা আছে, সংসার আছে, নানা আগন্তুক অসুবিধা আছে। সুতরাং তোমাদের কর্ম্মিদলের মধ্যে যোগ্য লোকের সংখ্যা-

বৃদ্ধির দিকে তোমাদের প্রত্যক্ষ প্রয়াস পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন পড়িবে। একবারের কাজও কদাচ মিথ্যা হয় না, কাজটী যদি সৎ হয় কিন্তু ধারাবাহিক কর্ম্মের সুফল কদাচ নষ্ট হয় না। তোমাদের একটী অনুষ্ঠানের সুফল যাহাতে শতবর্ষজীবী হইতে পারে, তাহারই জন্য সেই অনুষ্ঠানটীর পরে পরে ঐ একই স্থানে বা ঐ স্থানের অতীব সন্নিকটবর্ত্তী অন্য স্থানে পুনঃ পুনঃ সদনুষ্ঠান পরিচালন করিয়া যাইতে হইবে শৃঙ্খলার সহিত, সাফল্যের সহিত, আত্মবিশ্বাসের সহিত এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সহিত। কোনও মত-প্রচারকারী বা পথ-প্রসারকারী ভিন্ন সংঘের কর্ম্মীদের সহিত কদাচ ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া কোনও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিও না। কোনও মত বা পথকে গর্হণ করিয়া কোনও চিন্তা করিও না, কোনও বাক্য উচ্চারণ করিও না। কিন্তু পরম নিষ্ঠার সহিত নিজের কর্ত্তব্য নির্ভয়ে এবং নিরঙ্কুশ ভাবে করিয়া যাও। তোমাদের প্রতিটি সৎকার্য্যে আমি অনন্তকাল তোমাদের সঙ্গে থাকিব।

চাই কাজ আর কাজ। বসিয়া সময় কাটানোর মত পাপ নাই। যে যত পার' কাজ কর। কাজ কর জগতের কুশলে, কাজ কর জগতের তৃপ্ত্যর্থে, কাজ কর মানবের মুক্তির তরে। কর্ম্মমাত্রই বন্ধন নহে। যে কর্ম্মে পরার্থপরতা বিদ্যমান, সে কর্ম্ম মুক্তিরই সোপান। কর্ম্মকে কেহ অবজ্ঞা করিও না। কর্ম্মকে মুক্তির হাতিয়ার করিয়া নাও। কর্ম্মকে ব্রহ্ম জ্ঞান করিও। প্রত্যেকের হাতে কর্ম্ম দাও। কাজ করিতে করিতে অলসেরাও কর্ম্মী হইয়া উঠে। কাজ করিতে করিতেই কাজের মহিমা ফুটিয়া উঠে। ইতিহাসই যদি রচনা করিতে চাহ, কাজ করিতে হইবে। দুর্ভাগ্য যদি ঘুচাইতে চাহ, কাজ করিতে হইবে। সুন্দর ভবিষ্যৎকে যদি গড়িতে চাহ, কর্ম্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হইবে। কাজকে ভয় করিলে চলিবে না।

আদর্শের কাজে প্রত্যেককে ডাক। প্রতিটি অখণ্ডকে সংগঠন-কাজে আত্মনিয়োগ করিতে বল। সুযোগ আসিলে কাজ করিবে,—এই মনোবৃত্তি ছাড়। কাজ করিয়া করিয়া নূতন নূতন সুযোগ সৃষ্টি কর। সুযোগের প্রতীক্ষায় কাজ বন্ধ রাখিও না।

কেবল কর্ম্মেরই কথা কহিতে চাহি, অন্য কিছুর নহে; কেবল কর্ম্মেরই রাগিণী গাহিতে চাহি, অন্য কিছুর নহে; কেবল কর্ম্মেরই আনন্দে ভাসিতে চাহি, অন্য কিছুর নহে। তোমরা প্রত্যেকে আমার চারিপাশে কর্ম্মেরই জয়ধ্বনি দিতে দিতে দাঁড়াও। আমার অফুরন্ত কর্ম্মের কতক কতক তোমরা স্বেচ্ছায় হাতে তুলিয়া নাও। আমার সাধের সোণার জগৎ গড়িবার কাজে তোমরা নির্ব্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়া চল। আমি কি কখনও নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়াছি, না কি কখনও নিজের জন্য ভাবিয়াছি? তবে তোমরা আমার সন্তান হইয়া জগদ্বাসীর কুশলে কেন কাজ করিবে না? আর কেহ বসিয়া থাকিও না। নিখিল জগতের কুশলকর্ম্মে প্রত্যেকে ঝাঁপাইয়া পড়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৮ মাঘ, সোমবার, ১৩৮০
(১১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার শারীরিক, পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক যে অবস্থা বর্ণনা করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে এমন কথা বলার পথ নাই যে, তোমাকে মণ্ডলীর কাজে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেই হইবে। তুমি তোমার সুযোগ-সুবিধামত যখন মণ্ডলীর জন্য প্রকৃত কাজ যেটুকু করিতে পার, তাহা করিতে মনে মনে অন্ততঃ প্রস্তুত থাকিও।

জগতে সকলেই গায়ে পায়ে খাটিতে পারে না কিন্তু মনে ও মুখে যে-কোনও সৎকার্য্যের সহায়ক হইতে পারে। যখন কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এমন লোকদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, তখন সেই অনুষ্ঠান সহজে হয় সফল, সেই প্রতিষ্ঠান সহজে হয় বিরাট। যেখানে মানুষকে মৌখিক উৎসাহ দিলেও সৎকর্ম্ম সম্পাদনের পথ প্রশস্ততর হয়, সেখানে শুধু দুটী মুখের কথা কহিয়াও সহায়তা করিতে পারে না, এমন মানুষ জগতে দুর্ল্লভ। তবে সহায়তা করিবার মত রুচি থাকা চাই। মুখ তখনই কাজ করে, মন যখন কাজ করিতে চাহে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৯ মাঘ, মঙ্গলবার, ১৩৮০

(১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রে তোমার স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতির সংবাদে সুখী হইলাম কিন্তু যেই মহীয়সী সহধর্ম্মিণী নীরবে তোমাকে জীবন ভরিয়া সেবা

দিয়া কদাচ প্রশংসা বা অভিনন্দনের প্রত্যাশা করেন নাই, তোমার পত্রে তাঁহার বিয়োগ সংবাদের আভাস পাইয়া প্রাণে বেদনা পাইলাম। তিনি আকস্মিক হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তোমার পত্রে অনুভব করিলাম। সেবা যাঁহার জীবন-ধর্ম্ম ছিল, পাতিব্রত্য যাঁহার জীবন-কর্ম্ম ছিল, তাঁহার আত্মার আমি নিত্য শান্তি প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা তোমাদের ওখানে আমার একটা ভ্রমণ-তালিকা চাহিতেছিলে। যাইবার দিনটা ত স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখ বোধ করিতেছি এই ভাবিয়া যে, যাঁহাকে দেখিলে আমার পুণ্য লাভ হইত, সেই পুণ্যবতী কন্যাটীকে এবার পার্থিব শরীরে দেখিতে পাইব না।

অনেক কাল ধরিয়াই তোমরা প্রগ্রাম চাহিতেছিলে কিন্তু প্রগ্রাম করিতে পারি নাই। নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য ও অকুণ্ঠিত প্রেমের অনুশীলন না হইলে সেখানে গিয়া শান্তি, আনন্দ, তৃপ্তি কিছুই পাওয়া যায় না। প্রকৃত লাভও কিছু হয় না।

ইহা ত হইল তোমাদের আর আমার লাভালাভের কথা। কিন্তু তোমরা যদি ধারাবাহিক প্রযত্নে দীর্ঘকাল জনসাধারণের মধ্যে কাজ না করিয়া থাক, তাহা হইলে, আমি কেন, আমার চেয়ে হাজার গুণ বড় কেহ তোমাদের ওখানে গিয়া ঘুরিয়া আসিলেও জনসাধারণের মধ্যে সাময়িক একটু হুজুগ ছাড়া আর কিছুই কাজ হইবে না। হৈচৈ হইবে, অর্থের অপচয় হইবে, দুই একজন অখ্যাত লোকের নেতৃপদবাচ্য হইয়া হঠাৎ-সম্মান কুড়াইবার সুযোগ হইবে, কিন্তু কোনও ব্যক্তির বা কোনও সমাজের কোনও স্থায়ী কল্যাণ-লাভ হইবে না। যে-কোনও ব্রত পালন করিতে হইলে বা পূজা-পার্ব্বণ উদ্‌যাপন করিতে হইলে সকলেই পূর্ব্বের দিন সংযম-পালন করে। এই সংযমটুকু প্রকৃত

[illegible] কদাচ প্রশংসা বা অভিনন্দনের প্রত্যাশা করেন নাই, তোমার পত্রে তাঁহার বিয়োগ সংবাদের আভাস পাইয়া প্রাণে বেদনা পাইলাম। তিনি আকস্মিক হৃদ্‌রোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া তোমার পত্রে অনুভব করিলাম। সেবা যাঁহার জীবন-ধর্ম্ম ছিল, পাতিব্রত্য যাঁহার জীবন-কর্ম্ম ছিল, তাঁহার আত্মার আমি নিত্য শান্তি প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা তোমাদের ওখানে আমার একটা ভ্রমণ-তালিকা চাহিতেছিলে। যাইবার দিনটী ত স্থির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখ বোধ করিতেছি এই ভাবিয়া যে, যাঁহাকে দেখিলে আমার পুণ্য লাভ হইত, সেই পুণ্যবতী কন্যাটীকে এবার পার্থিব শরীরে দেখিতে পাইব না।

অনেক কাল ধরিয়াই তোমরা প্রগ্রাম চাহিতেছিলে কিন্তু প্রগ্রাম করিতে পারি নাই। নিজেদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য ও অকুণ্ঠিত প্রেমের অনুশীলন না হইলে সেখানে গিয়া শান্তি, আনন্দ, তৃপ্তি কিছুই পাওয়া যায় না। প্রকৃত লাভও কিছু হয় না।

ইহা ত হইল তোমাদের আর আমার লাভালাভের কথা। কিন্তু তোমরা যদি ধারাবাহিক প্রযত্নে দীর্ঘকাল জনসাধারণের মধ্যে কাজ না করিয়া থাক, তাহা হইলে, আমি কেন, আমার চেয়ে হাজার গুণ বড় কেহ তোমাদের ওখানে গিয়া ঘুরিয়া আসিলেও জনসাধারণের মধ্যে সাময়িক একটু হুজুগ ছাড়া আর কিছুই কাজ হইবে না। হৈচৈ হইবে, অর্থের অপচয় হইবে, দুই একজন অখ্যাত লোকের নেতৃপদবাচ্য হইয়া হঠাৎ-সম্মান কুড়াইবার সুযোগ হইবে, কিন্তু কোনও ব্যক্তির বা কোনও সমাজের কোনও স্থায়ী কল্যাণ-লাভ হইবে না। যে-কোনও ব্রত পালন করিতে হইলে বা পূজা-পার্ব্বণ উদ্‌যাপন করিতে হইলে সকলেই পূর্ব্বের দিন সংযম-পালন করে। এই সংযমটুকু প্রকৃত

প্রস্তাবে একটা উদ্যোগ-পর্ব্ব। আমাকেও তোমাদের মধ্যে একদিন বা দুই দিনের জন্য পাইতে হইলে, আমার আগমনকে সুফলপ্রদ করিবার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতকগুলি প্রাক্-প্রস্তুতির আবশ্যকতা আছে। আমি কিসের প্রতিনিধি? আমি কি শুধুই একটা রক্তমাংসের ডেলা? আমার কি কোনও ভাব, চিন্তা, আদর্শ, বাণী বা কর্ম্মপ্রণালী নাই? অনেক লোক ডাকিয়া আনিয়া তোমরা চিড়িয়াখানার একটা সিংহ মানুষকে দেখাইয়া দিলে, তোমাদের অঞ্চলে আমার আগমনের মাত্র ইহাই কি তাৎপর্য্য? এই কথাগুলি প্রতিজনের ভাবিবার আছে। আমার কর্ম্মক্ষেত্র জগৎ জুড়িয়া, আমি কোথাও বৃথা কালক্ষেপ করিতে পারি? আমার দৈহিক পরমায়ুর দিন কয়টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমন সময়ে আমার কি হিসাব করিয়া সময়ের ব্যয় করা উচিত নহে? আমি ত জীবনটা তোমাদের কাজের জন্যই সমর্পণ করিয়া রাখিয়াছি। শ্রম করিতে, কষ্ট স্বীকার করিতে, কাজ করিতে করিতে মরিয়া যাইতে ত আমার কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন অল্প শ্রমে বেশী কাজ, অল্প সময়ে বেশী কাজ, বেশী লোকের জন্য বেশী কাজ, মুষ্টিমেয়ের জন্য তুচ্ছ একটুখানি কাজ নহে। আমার কথাগুলি তোমার সতীর্থদিগকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে বলিও। তাহাদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে, বিবেচনা-শক্তিও কম নহে। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৮০
(১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পর পর তোমার দুইখানা কার্ডে অবগত হইয়া সুখী হইলাম যে, নানা প্রাসঙ্গিক সদ্বিষয়ে ভাষণ দিবার জন্য নানা স্থান হইতে তোমার নিকটে আহ্বান আসিতেছে। তোমার অপরাপর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের প্রতি উপেক্ষা না করিয়া এই সকল আহ্বানের যেখানে যতটা মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পার, তাহার চেষ্টা তুমি অবশ্যই করিবে। তোমার এই সৎসেবার প্রতিটি মুহূর্ত্তে আমি নিত্যসঙ্গী রূপে তোমার সঙ্গে থাকিব। তোমাদের সাথী হইয়া বিদ্যমান থাকিবার জন্য আমি নিয়ত অভিলাষী। তোমরা কেহ সৎকার্য্যে উদ্‌যোগী হইতেছ শুনিলে আমার আনন্দের অবধি থাকে না।

মানুষের মধ্যে সদাদর্শের প্রচার এক মহনীয় ব্রত জানিও। অজ্ঞানের অজ্ঞানতা নাশ, জিজ্ঞাসুর জ্ঞানপিপাসার পরিতৃপ্তি, মুমুক্ষুর অষ্টপাশমুক্তির অনুকূলে প্রেরণাদান, কৃপণের অন্তরে সদ্বিষয়ের প্রতি দাতৃত্ববোধের উন্মেষ-সাধন, জগন্ময় পারস্পরিক আত্মীয়তা-বোধ ও সহযোগিতা-বুদ্ধির অভ্যুদয় সাধনের জন্য সর্ব্বতোমুখিনী চেষ্টা সত্যই চিত্তের উৎকর্ষসাধক, আত্মার বিনোদক এবং প্রগাঢ় আত্মপ্রসাদের জনক। এমন কাজ করিবার জন্য ডাকিলে সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ডাকে সাড়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

তবে, মনে রাখিও যে, অন্তর হইতে অভিমানকে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া এই কাজটী করিতে হইবে। অভিমানহীন, গর্ব্ববর্জ্জিত, ঈশ্বরানুগত প্রাণ সর্ব্বব্যাপারে আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের পক্ষে অনুকূল। সভাস্থলে জ্ঞান দিতে ত দাঁড়াইতেছ না, জ্ঞানদানের ছলে সত্য সত্য আত্মপরিচয় লাভ করিতেছ বা জ্ঞান আহরণ করিতেছ। শ্রোতাদের অন্তরের সহস্র প্রশ্ন ভাষার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ভাবপুঞ্জের

ভিতর দিয়া তোমার নিকটে সূক্ষ্ম কৌশলে পর পর আসিয়া পড়িতেছে, আর তাহাদেরই তত্ত্ব নিয়া কথা কহিতে কহিতে তুমি তোমার মনের গভীর প্রদেশের অনেক অনাবিষ্কৃত অঞ্চল আবিষ্কার করিয়া ধন্য হইতেছ। বক্তৃতা দান ব্যাপারটা প্রকৃত প্রস্তাবে যে ইহা, তাহা মনে রাখিয়া কাজ করিলে দেখিবে, বক্তৃতা দিয়া তুমি দেশ মাতাইতেছ না, মাতাইতেছ তোমার দীর্ঘকালের অলস উদাস কর্ম্মরুচিহীন দুর্ব্বল মনটীকে, ডাক লাগাইতে চলিয়াছ তোমার প্রতি প্রদত্ত শ্রীভগবানের অদৃশ্য শক্তিকে। এই সত্যটুকু মনে রাখিয়া কাজ করিও, দেখিবে, বক্তৃতাদানের ন্যায় এক বহির্ম্মুখ রহিবার ব্যাপারে কত সহায়তা করিতে পারে।

শ্রোতারা যখন শুনিতে শুনিতে বিরক্ত হইবে, জানিবে, তুমি কেন্দ্রচ্যুত হইয়াছ। সঙ্গে সঙ্গে ভাষণ সংক্ষেপে করিয়া দাড়ি টানিয়া দিবে। বহু বক্তা যদি একই মঞ্চে সমবেত হইয়া থাকেন, তবে সকলের বলিবার সুযোগ দিবার জন্য নিজের বক্তব্যকে পরিমিত করিয়া লইবে। পাঁচ জন বক্তা যদি সমভাবের ভাবুক হও, তাহা হইলে নিজ নিজ বক্তব্য বিষয়কে ভাগ করিয়া নিবে কিন্তু মূল বিষয়ে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় পরিবেশন করিবে। একই রাগিণী পাঁচ জন ওস্তাদ একত্র গাহিলে, মূল রাগিণী প্রত্যেকেরই গাহিতে হয় কিন্তু তান, মীড়, মূর্চ্ছনা, গিটকারি আদি যার যার নিজ নিজ বিশেষত্ব বহন করে। প্রচার-কর্ম্মোদ্দেশ্যে যখন কয়েক জনে মিলিয়া অভিযানে বাহির হইবে, তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া এমন ভাবে বিষয়-বিভাগ করিয়া নিবে যেন, প্রত্যেকের বক্তব্যই শ্রোতৃসাধারণের সমক্ষে বিশেষ চিত্তাকর্ষক হয়। অসাধারণ বিষয়-বস্তুগুলির পুনরুক্তি প্রতি জনের কণ্ঠে দোষের নহে বরং প্রয়োজনীয় কিন্তু সাধারণ বিষয়-বস্তুগুলির

পুনরুক্তিতে শ্রোতাদের শ্রবণেচ্ছা-হ্রাস ঘটিতে পারে জানিয়া এই সকল বিষয়ে সাবধান হইবে। নিজেদের মনোগত বা আত্মাশ্রিত আদর্শকে প্রচারের কালে এই বিষয়ে খুবই কড়া নজর রাখিবে যে, অন্যান্য সঙ্ঘ, সম্প্রদায় বা সমাজের প্রচারিত কোনও মত-পথকে গর্হন, নিন্দন, কুৎসারটন বা খণ্ডন তোমাদের কর্ত্তব্যের অন্তর্ভূত নহে। তোমাদের মতের উজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য্য দিয়া যদি কাহাকেও আকৃষ্ট করিতে না পার, তাহা হইলে কি অপরের মতের খণ্ডমাচ্ছন্নতা বা কৌৎসিত্য বিস্তার করিলেই লোকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে? তবে, একটা বিষয়ে তোমরা সর্ব্বদা খড়গহস্ত হইও যে, ধর্ম্মের নামে ইন্দ্রিয়গত ব্যভিচার আদি পাপকে কোনও অবস্থায়ই কোনও স্থানে কোনও প্রকারে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না।

কথাটা বলিবার একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। গত শনিবার অপরাহ্ণে বর্দ্ধমান জেলার এক সুবিখ্যাত গ্রাম হইতে একটী সধবা মহিলা তাঁহার স্বামীকে সহ দীক্ষা নিবার জন্য আসিয়াছিলেন। দীক্ষা আমি দেই নাই, কারণ দীক্ষার তারিখ ছিল না। প্রতিদিনই দীক্ষার পাট রাখিলে আমি অন্য কাজের অবসর পাই না। সেই দম্পতীর নিকটে এক আজব কাহিনী শুনিলাম। বাংলার লোকপাবন এক পরলোকগত সুবিখ্যাত মহাপুরুষের শিষ্যের শিষ্য এই মহিলাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। দীক্ষার দিন তিনি স্বামীটীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিয়া স্ত্রীটীকে আগে চুম্বন-আলিঙ্গনাদি দ্বারা আয়ত্ত করিয়া নেন এবং তৎপরে ভগবান বাসুদেবের নামটী কর্ণে প্রদান করেন। ভাবিয়া দেখ, কি বীভৎস ব্যাপার। ঐ একই লোকপাবন মহাত্মার অন্যতর এক শিষ্য কলিকাতার কোনও এক অঞ্চলে এক আশ্রম করিয়া নিয়মিত

ভাবে দীক্ষাদান কালে প্রত্যেকটী মহিলাকে ধর্ষণ করিয়া লইয়া কৃষ্ণপ্রেম শিখাইবার দুঃসাহসী অধ্যবসায় ধারাবাহিক ভাবে প্রায় দশ বৎসর চালাইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ যদি আমা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ সেই গুরুদেবকে এই অধঃপতন হইতে রক্ষা করিবার আগ্রহে সাশ্রুনয়নে আমারই নিকটে আসিয়া কাঁদিয়া না পড়িতেন, তাহা হইলে এমন একটা রোমহর্ষক ঘটনার কথা কদাচ আমি জানিতে ত দূরের কথা, কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারিতাম না। আমি ঐ ভদ্রলোকের সর্ব্বনাশকর এই কুচর্চ্চা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইয়াছি এবং কিছুকাল পরে উক্ত শিষ্যদের নিকটে শুনিয়াছি যে, বিস্ময়কর কিছু ঘটনা ঘটিয়া গুরুদেব রূপে অভিনয়কারী ঐ ভদ্রলোকের চরিত্রের আমূল পরিবর্ত্তন এই বৃদ্ধ বয়সে ঘটিয়া গিয়াছে। বেশী দূর যাইতে হইবে না, তোমার নিজ বাস্তুভিটা হইতে বিশ পঁচিশ মাইল দূরে এক গুরুদেব মহাশয়ের আশ্রম আছে, যেই আশ্রমে উক্ত ভদ্রলোকের জীবৎ-কালে শত শত স্ত্রীলোক দীক্ষিত হইবার পরে ধর্ম্মের নামে ধর্ষিতা হইয়াছে বা পরপুরুষ-সংসর্গে লিপ্তা হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে এতজ্জাতীয় ব্যভিচারকে সমর্থন করিবার মতন ভদ্রতাকে কাপুরুষতা এবং দেশদ্রোহিতা মনে করিতে হইবে। দেশপ্রেমের নাম করিয়াও যে কত স্থানে সতী-সাধ্বী সরলপ্রাণা তরুণী এবং কিশোরীদের মজ্জাগত লজ্জায় আঘাত হানা হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গেলে এই সব ব্যাপারে ভদ্রতা বা নমনীয় মনোভাব পোষণ করা অন্যায়। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাসাদে, কলেজের রুমে, ছাত্রাবাসে, কোথায় না নারী ধর্ষিতা হইতেছে? ছাত্রদের দ্বারা ছাত্রীদের নিগ্রহ কোথায় না

ঘটিতেছে ? শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে প্রেম ও প্রেমজ দুঃখ কোথায় না শুনা যাইতেছে ? পরীক্ষার্থিনী বালিকারা পরীক্ষা পাশের সুবিধার্থ দুর্ব্বল হইতেছে আর এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়া পরীক্ষকরা মেয়েগুলির সর্ব্বনাশ করিতেছে,—এমন ঘটনা কি কম ঘটিতেছে ? হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ, নার্সিং হোম ও ক্লিনিক সমূহে বেপরোয়া হারে শুশ্রূষাকারিণী, মহিলা ডাক্তার, রোগিণী ও ছাত্রীরা যৌন অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। পুলিশ এই ব্যাপারে উদাসীন বরং অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের দ্বারাই এসব কুকর্ম্ম ঘটিতেছে। ব্যাপার আদালতে উঠিলে ধনবান বা প্রভাববান বা মন্ত্রীর আত্মীয় অপরাধীর নানা তদ্বিরের সমক্ষে বিজ্ঞ বিচারকও দিশাহারা হইয়া সুবিচার করিতে অক্ষম হইতেছেন । গরীবের বা তথাকথিত ছোট জাতের মেয়েদের ধরিয়া আনিয়া উচ্চজাতীয়েরা লুচি-হালুয়া খাওয়ার মত করিয়া গিলিয়া খাইতেছে। উল্লিখিত অপরাধগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময়ে হতভাগিনী বালিকাটীর মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতেছে । কিন্তু দেশে প্রতিকারের জন্য কোনও আন্দোলন নাই । ব্রিটিশের পদানত থাকা কালে আমরা নারী-রক্ষা-সমিতির মাধ্যমে সমস্ত দেশ প্রতিবাদের গর্জ্জনে ফাটাইয়া ফেলিয়াছিলাম । আজ মহারাজধানী নয়া দিল্লীর রাজপথে নারী-নির্য্যাতন হইলেও কেহ আসিয়া প্রতিবাদ করে না।

দেশের এইরূপ নিদারুণ অধঃপতনের অবস্থায় যদি আবার সাধু, সন্ন্যাসী, যোগী, বাবা বা গুরুদেব মহাশয়েরাও নারী-নির্য্যাতনে লাগিয়াই থাকেন, তবে তাহা কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা যাইতে পারে না। ইহার প্রতিবাদ তোমাদের করিতেই হইবে। অন্যান্য স্থলে ব্যভিচার-চেষ্টা চলিবার কালে আক্রান্তা রমণী বুঝিতে পারে

যে, ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহা অধর্ম্ম। কিন্তু গুরু-নামধারী শৃঙ্গপুচ্ছহীন পশু ধর্ম্মের নামে নারীর মর্য্যাদা ধূলাবলুণ্ঠিত করিলে অনেক অশিক্ষিতা বা কুসংস্কারাচ্ছন্না নারী প্রথমটায় বুঝিতেই পারে না যে, ইহা ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য হইতেছে। গুরুকে ঈশ্বর বানাইবার কুফল ইহাদের জীবনে এই ফলিয়াছে যে, গুরুদেব হঠাৎ কৃষ্ণ হইয়া রাধারমণে প্রবৃত্তি হইয়া গেলে শিষ্যা বুঝিতেও পারে না যে, তাহার ধর্ম্মলাভ হইল না, লাভ হইল সর্ব্বনাশ। একদা অবশ্য সব কথা সে বুঝিতে পারে কিন্তু তখন বড়ই দেরী হইয়া গিয়াছে, বুঝিয়াও তখন কিছু করিবার তাহার থাকে না। তখন সে গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেয়। লৌকিক ধর্ম্ম বহু বহু যুগ ধরিয়া এই সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। ইহার সমূল প্রতীকার আমাদেরই করিতে হইবে। সাধু, সন্ন্যাসী, বাউল, বৈষ্ণব, গোসাই গুরুদেব প্রভৃতিরা অনেকেই ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা সরকারী পশুশালায় রক্ষিত ব্রিডিং বুল্ নহেন। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা ফাল্গুন, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তুমি যাহার বিরুদ্ধে প্রচার সম্পর্কে লিখিয়াছ, তাহার সম্পর্কে আশ্রমের আচরণ এই যে, নিজে তরুণ যুবক হইয়া আগ বাড়াইয়া নানা

স্থানে মহিলাদের সমিতি গড়িবার কাজে সে অগ্রণী হইয়াছিল। তাহার উচিত ছিল বয়স্ক ও অভিজ্ঞ অন্য শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মীদের উপরে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়া নিজে তরুণ যুবকদের মধ্যে কাজ করিতে অগ্রসর হওয়া। যে সকল মহিলাদের মধ্যে সে কাজ করিতে গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে যিনি নেত্রী-স্থানীয়া তাঁহারও কর্ত্তব্য ছিল, এইরূপ কাজে বর্ষীয়ান্ ও সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় কোনও অভিভাবক-স্থানীয় কর্ম্মীকে এই কাজের ভার নিতে আহ্বান করা। উভয় দিকে এই উভয় প্রকারের ত্রুটি হওয়াতে সংঘের ভাবী হিত ও অহিত সম্পর্কে যাহারা চিন্তা করিতে অধিকারী ও বাধ্য, তাঁহারা মূল কেন্দ্র হইতে উভয় পক্ষকে প্রয়োজনীয় হিতোপদেশ দিয়াছিলেন। সেই হিতোপদেশ-বাক্য আমার সম্মুখেই দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে। হিতোপদেশ-বাক্যকে কুৎসা-প্রচার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যদি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহা বিচিত্র নহে। কারণ, জগতে অধিকাংশ মানুষই একেবারে গণ্ডমূর্খ।

"দেখহে, চুরি করা ভাল নয়", বলিলে কেহ যদি ভাবে তাহাকে চোর বলা হইয়াছে, "দেখ হে, মিথ্যা কহিলে ক্ষতি হয়" বলিলে কেহ যদি ভাবে যে, তাহাকে মিথ্যুক বলিয়া গালি দেওয়া হইয়াছে, "পরস্বাপহরণের পরিণাম-ফল খারাপ",—একথা বলিলে কেহ যদি ধরিয়া লয় যে, তাহাকে চোর বলা হইল, তবে পৃথিবীতে কোনও হিতৈষী কোনও স্নেহভাজনকে কদাচ সদুপদেশ দিতে আর সাহস পাইবে না।

আজকাল অবশ্য স্ত্রী-পুরুষের অত্যন্ত মিশামিশিটা জবর ভাবে চালু হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমার সুস্পষ্ট মনে আছে যে, কুমিল্লা জেলায়

গোঁসাইপুর গ্রামে আমি যখন (সম্ভবতঃ ১৯৩২ হইতে ১৯৩৭ এর মধ্যবর্ত্তী সময়ে) গিয়াছিলাম, তখন সেখানে সমবেত উপাসনায় স্ত্রী-পুরুষকে এক আসরে আমি বসিতে দেই নাই এবং শ্রীরামদীতে বিশেষ বিশেষ উপাসনার আসরে স্ত্রী-পুরুষ একত্র বসিলেও ঐ সময় হইতেই আমি সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা স্ত্রীলোকদের জন্য আলাদা বারে করিয়া দিয়াছিলাম। আজও মহিলারা সপ্তাহের ঐ একটী বারে পুরুষবর্জ্জিত ভাবে উপাসনা করিয়া থাকেন। কালের ধর্ম্মে ও প্রয়োজনের তাগিদে স্ত্রীপুরুষের ঘনিষ্ঠতা যতই আবশ্যকীয় হউক না কেন, এই দুইটী জাতির মধ্যে সম্মান-যোগ্য দূরত্ব রক্ষার জন্য সমাজকল্যাণকামী ব্যক্তিরা কতকগুলি সন্নিয়ম বা Convention চালু রাখিবেনই। অখণ্ড-সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কেহ যদি পত্রোক্ত যুবকটীর সম্পর্কে সেরূপ কোনও উপদেশ, নির্দ্দেশ বা আদেশ দিবার প্রয়োজন-বোধ করিয়া থাকেন, তবে সেই উপদেশ, আদেশ ও নির্দ্দেশকে তোমাদের প্রতি-জনেরই মান্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১লা ফাল্গুন, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সকলকে আমার স্নেহ ও আশিস দিও।

আমি চিরকাল সংখ্যাল্পের শক্তিতে বিশ্বাসী, দুর্ব্বলের সামর্থ্যে আস্থাশীল। হাতীর বলকে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু পিপীলিকার বলকে আমি শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, যোগ্য মূল্য দান করিতে আগ্রহ বোধ করি। তোমাদের সম্পর্কে আমার এই আস্থা সার্থক হইয়াছে। দুর্ব্বল কয়েক জনে এবং সংখ্যাল্প হওয়া সত্ত্বেও তোমরা প্রশংসনীয় কার্য্য করিতে পারিয়াছ।

যেখানে যত আছে ছোট আর অবহেলিত, প্রত্যেকের সহিত আমার আত্মীয়তা স্থাপন কর, সযত্নে প্রত্যেককে আপন কর, প্রতি জনকে ভালবাসা দিয়া জয় কর, মানুষ হইতে মানুষের দূরত্বকে দূর কর। ইহাই আমাদের লক্ষ্য, ইহাই আমাদের mission। * *

• ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা ফাল্‌গুন, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তিল কুড়াইয়া তাল, প্রবাদটা মিথ্যা নহে। তোমাদের আস্তে আস্তে অল্প অল্প করিয়া যে কাজ চালু হইয়াছে, তাহার পরিণাম ফল গভীর বৃহৎ। স্বল্প কার্য্যেরও বিপুল সুফল আছে, এই বিশ্বাস রাখিয়া

তোমরা চল। প্রতিজনের অন্তরে এই বিশ্বাসকে সযত্নে প্রোথিত করিয়া দাও। এই বিশ্বাসের মূলদেশ হইতে সহস্র সহস্র শিকড় বাহির হইয়া মৃত্তিকাভ্যন্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া যাউক। বৃক্ষ শাখার উদ্‌গম ও বিস্তারের জন্য তোমাদের আর কোনও কৃত্রিম প্রয়াসের আবশ্যকতাই পড়িবে না। লক্ষ্য রাখিও যে, আমি মৃত্তিকাভ্যন্তরের কাজের উপরেই বেশী জোর দিতেছি ইহার মানে এই নহে যে, আমি Secret Society বা গুপ্ত সমিতি গড়িতে বলিতেছি। আমার বক্তব্য এই যে, মানুষের মনের যেই স্তরে প্রচলিত প্রচারকেরা কদাচ প্রবেশ করিতে পারেন না, তোমাদিগকে সেই স্তরে ডুবিয়া যাইতে হইবে এবং কাজ করিতে হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা ফাল্গুন, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * *

সমগ্র মহকুমায় বা সমগ্র জেলায় সর্ব্বজনের শক্তিকে একটী মাত্র সুনির্দ্দিষ্ট স্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার যে চেষ্টা, ইহা সংগঠনের একটা মূল্যবান অনুশীলন। রাজনীতিপন্থীরা যে ভাবে হাজার জায়গার লক্ষ লোককে মাঝে মাঝে একত্র সমাবিষ্ট করিয়া নির্দ্দিষ্ট রাজনৈতিক

পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, তাহা একটা সাংগঠনিক অনুশীলন মাত্র। ইহা ভাল না মন্দ, তাহার বিচার হইবে উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব বা নীচত্ব দিয়া। তোমাদের মধ্যে ত রাজনৈতিক কাজের কোনো চারা নাই, তোমরা এখন যাহা করিতেছ, তাহা নির্বিদ্বেষ সমাজ-সেবা ছাড়া আর কিছুই নহে। কিন্তু একাজেও সংগঠন এবং নানাবিধ সাংগঠনিক কৌশল অবলম্বন করিবার প্রয়োজন আছে। কাজের গুরুত্ব এবং স্থায়িত্ব বুঝিয়া তোমাদের মাঝে মাঝে সকলের সর্ব্বশক্তি একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে কেন্দ্রীকৃত করিতে হইবে। এবম্বিধ প্রয়োজনের ডাক আসিলে যদি প্রত্যেকে প্রকৃত সময়ে যুগপৎ সাড়া দিতে পার, তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে তোমাদের সঙ্ঘ জীবিত আছে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১লা ফাল্‌গুন, ১৩৮০

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

* * * *

সকলের মধ্যে সহযোগ, সমন্বয় ও মৈত্রী ঘটাইয়া সকলের শক্তিকে একমুখ কর। নিজেদের মধ্যে প্রেম না আসিলে বহু লোক কদাচ একত্র কাজ করিতে পারে না। আদর্শের প্রতি অবিমিশ্র শ্রদ্ধা যদি

প্রত্যেকের আসে, তাহা হইলে একতা-বিধানে কোনও ক্লেশ হইবার কথা নহে।

অনেকের উপরে অনেক প্রত্যাশা করিয়া পরিশেষে আশাভঙ্গের দারুণ মনোবেদনা অতীতে হয়ত বহুবার পাইয়াছ। আমি বলি, পর-প্রত্যাশা ছাড়িয়া দিয়া প্রতি জনে কাজে নামো। নিজেদিগকে এত অধম কথনই মনে করিও না যে, ভগবানের কাজ হাতে নিয়া তোমরা ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া হাঁটু ভাঙ্গিয়া পথে আছাড় খাইয়া মরিবে।

ব্যক্তিত্বাভিমান বিসর্জ্জন দিয়া সেবাবুদ্ধি নিয়া চল। তোমাদের জয় সর্ব্বত্র হইবে, সর্ব্বকালে হইবে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরিওঁ

বারাণসী

২০শে ফাল্গুন, সোমবার, ১৩৮০

(৪ঠা মার্চ্চ, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সাত ফাল্গুনের পত্র পাইলাম। দুর্গাপুরে তোমরা বর্দ্ধমান জেলা-অখণ্ড-সম্মেলনে যোগদান করিতেছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। অনুমান করিতেছি যে, ঐ সম্মেলনে যে যে কার্য্যকর প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে বাস্তব রূপায়ণ দিবার প্রয়াসে প্রত্যেকটী প্রাণী নিজ নিজ সাধ্যমত কাজ করিয়া যাইতে অবিলম্বে ব্রতী হইবে ।

বিভিন্ন জনের দেবমন্দিরে বা ঠাকুর-বিগ্রহের সম্মুখে সমবেত উপাসনা করিবার পথে একটি বাধা এই যে, আমরা ওঙ্কার-বিগ্রহের সহিত অংশী বা প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে অন্য কোনও দেবমূর্ত্তি বা মনুষ্য-প্রতিচিত্র রাখি না। কাহারও যদি দেবতা বা মনুষ্যের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হয় তবে মনে মনে তাহা করিতে বাধা নাই কিন্তু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপে একমাত্র ওঙ্কার-বিগ্রহ ছাড়া অন্য বিগ্রহ আমাদের সমবেত উপাসনায় চলে না। এই কারণেই দেবমন্দিরাদিতে সমবেত উপাসনায় আমন্ত্রিত হইলে দিক্‌-পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়। অপরের পূজার্চ্চনা-পদ্ধতির প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ বা গর্হণের উদ্দেশ্যে এই স্বাতন্ত্র্য নহে, সর্ব্বমতের সর্ব্বপথের লোককে সমবেত উপাসনাতে পাইবার প্রয়োজন-বোধ হইতে এই স্বাতন্ত্র্যের জন্মলাভ। কথাটা ধীর ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

১৮ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮১

(২রা মে, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা সংহিতা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শেষ পর্য্যন্ত সাত-চল্লিশটী ছাত্র য়্যুনিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্রে রহিয়া গেল। কিছু চলিয়া গিয়াছে মায়ের জন্য কান্নাকাটি করিয়া,

কিছু গিয়াছে স্বভাব-চরিত্রের সংশোধন করিতে না পারিয়া। দীর্ঘকাল নিজ গৃহে চিকিৎসিত হইয়া সুস্থ হইবার পরে দুইটী আসিয়া ক্লাসে যোগ দিয়াছে, একটীকে বহু অর্থ ব্যয়ে কলিকাতায় রাখিয়া চিকিৎসা করাইয়া তবে এখানে আনিয়াছি। এই অর্থ আমরাই নিজেদের তহবিল হইতে বহন করিয়াছি।

এখন বিদ্যার্থীদের পরীক্ষা চলিতেছে। গত চারি মাসে যাহা পড়ান হইয়াছে, তাহার উপরেই ইহাদের পরীক্ষার প্রশ্ন হইয়াছে। এই চারি মাসে ইহারা পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রদের তুলনায় কোনো কোনো বিষয়ে ছয় মাসের, কোনো কোনো বিষয়ে নয় মাসের পাঠ পড়িয়া ফেলিয়াছে। আমার শরীর যদি সুস্থ থাকিত, আমাকে যদি অন্যান্য হাজার কাজে খাটিতে না হইত, আমাকে যদি এতগুলি ছাত্রের সর্ব্বব্যাপারে বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান না করিতে হইত, তাহা হইলে এই চারি মাসে তাহাদেয় পূর্ণ এক বৎসরের পাঠ আমরা আয়ত্ত করাইয়া দিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা পারি নাই। ২৩শে এপ্রিল তেলের কল চালু করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত ২৬।২৭ এপ্রিল পর্য্যন্ত কাজ চলিয়াছে। এখন তেলকল চালু। প্রায় সাড়ে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে সরিষা সংগ্রহ করিয়া অয়েল মিল চালু হইল। এই জাতীয় কতকগুলি জরুরী কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমি নিজে আর ছাত্রদের অধ্যাপনার কাজে নামিতে পারিব না। আমি জানি, আমি তিন মাসে এক বৎসরের বিদ্যা উহাদের আয়ত্ত করাইয়া দিতে পারিব। কিন্তু আমি ইহাও ত জানি যে, আমার অগণিত সন্তানের দল এই ব্যাপারে আমার পিছনে নাই, ইহারা আমার কাজের দর্শক এবং সমালোচক মাত্র। এই কারণে আমি মঙ্গল-বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্ব অবস্থাটাতে ফিরিয়া যাইতে চাহি, যেদিন আমার

সকল কাজ আমি একাই বৎসরের পর বৎসর নীরবে করিয়াছি, যেদিন আমার কাজের, আমার শ্রমের কোনও বিজ্ঞাপন ছিল না। হাটিতে আমার কষ্ট হয়, সিঁড়ি ভাঙ্গিতে ততোধিক, তথাপি কাল সারাটা দিন রৌদ্রে দাঁড়াইয়া গোধন-গৃহ নির্ম্মাণের কাজ তত্ত্বাবধান করিয়াছি। ঘরখানা ছোট নহে আর ইহা একটা টিনের ছাব্‌রাও হইবে না, ইহা হইবে দ্বিতল এবং ছাদযুক্ত, নিম্ন তলে থাকিবে কমপক্ষে পঞ্চাশ ষাটটী পয়স্বিনী, যাহাদের প্রত্যেকের স্নানের জন্য ছাদের উপর দিয়া হংসজলীর জলাধার হইতে শূন্য পথে লোহার নলের সাহায্যে আসিবে জল এবং সিঞ্চনীর (spray) সহায়তায় গাভী পাইবে স্নানের পূর্ণ তৃপ্তি। এক কাজে দুই কাজ হইয়া যাইবে। গাভী পাইবে স্নানের তৃপ্তি, আর ঐ একই জলের দ্বারা গাভীর সারা রাত্রির বাসস্থানটুকু হইয়া যাইবে ধৌত ও পরিষ্কৃত। গোশালার পরিকল্পনাটা স্বচক্ষে একবার দেখিয়া যাইও, তোমার ছাত্রেরা তাদের মামণিকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রও হইয়াছে অত্যধিক।

তেলের কল আমাকে খইল দেখাইয়াছে, ডালের কল আমাকে ভূষি দেখাইল, যৎসামান্য খৈল ও ভূষির দৌলতে আশ্রমের খাদ্যাভাবে শীর্ণকায় গাভী দুইটা চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই শারীরিক সৌষ্ঠবে ও দুগ্ধদানের যোগ্যতায় শ্রীবৃদ্ধি দেখাইয়াছে। খইল দেখিলাম, ভূষি দেখিলাম, এখন একশতটী গাভী যেদিন আমাকে প্রচুর গোময় দেখাইবে, সেই দিন আমি অনায়াসে এই পাথর-কাঁকরের মাটিতে সোণা ফলাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। জলের সমস্যা আমি দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া দশ বারো বছর পূর্ব্বেই ত মিটাইয়া দিয়াছি।

কাল রৌদ্রের মধ্যে গোধনের কাজ দেখিতে দেখিতে অনেক বার

মাথা ঘুরিয়াছে, কিন্তু এক কুঁজা শীতল জল কাছেই ছিল, এক কণা দুই কণা করিয়া সেই শীতল জল পান করিয়াছি আর ভাবিয়াছি. জল দেখিলাম, অথৈ জল, পঞ্চাশটা পাম্প সারাদিন সারা রাত্রি পাম্প করিয়াও যাহাকে নিঃশেষ করিতে পারিবে না,—খইল দেখিলাম, পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকার সরিষা হইতে যাহা পনের দিন মধ্যে উৎপাদিত হইয়া যাইবে,—ভূষি দেখিলাম, ডালকল চালু রাখিতে পারিলে, যাহার ওজন মাসে একশত কুইণ্টাল নিশ্চয় অতিক্রম করিবে,—এখন আমার দেখার বাকী শুধু গাভী, যাহারা দুগ্ধও দিবে, গোময়ও দিবে। তারপরে ছাড়া আগে আমি আশা করিতে পারি না যে, তরুণের দল সুশিক্ষা পাইতেছে, মানুষ হইতেছে। বই পড়াইলেই ত ছেলে মানুষ হয় না, তাহাকে পুষ্টিকর খাদ্য প্রচুর পরিমাণে দিতে হয়, তাকে নিত্য নূতন কাজ শিখাইতে হয়, তাহার যাবতীয় কর্ম্মস্পৃহাকে চাঞ্চল্যের পথে অপচয়িত হইতে না দিয়া নিত্য নূতন কর্ম্মশিক্ষার ভিতরে গতিশীলা করিতে হয়, তাহার চখের সুমুখে একটা সাফল্যপূর্ণ জীবনাদর্শকে স্থাপিত করিতে হয়। কিন্তু মালটিভারসিটির দ্বারোদ্ঘাটনের পরদিন হইতেই প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, আমি একাই এত বড় কাজের দায়িত্ব নিয়াছি, আমার পিছনে তাহারা নাই, যাহারা স্থানে স্থানে আমাকে নিয়া সমারোহ-পূর্ণ শোভাযাত্রা করে এবং আমার জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে।

সারাটা দুপুর আকাশের অগ্নিবর্ষণের মধ্যে গোধনের কাজ করাইতে করাইতে এই কথাগুলি আমি বহুবার ভাবিয়াছি এবং স্থির করিয়াছি যে, কাজে বিলম্ব যতই হউক, মঙ্গল-বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবার পূর্ব্ববর্ত্তী নিঃসঙ্গ একক অবস্থায় আমাকে ফিরিতেই হইবে। গোধনের কাজে

বাদ আশ্রম-কর্ম্মী, কুলী, কামিন, রাজমিস্ত্রী লইয়া ত্রিশ বত্রিশ জন লোক খাটিয়াছে। আমার চখের উপরে কাজ হওয়াতে চল্লিশ জনের শ্রম আমি তাহাদের নিকট হইতে আদায় করিয়া নিতে পারিয়াছি। মনে একটা মস্ত বড় আনন্দ ছিল। তাহার কারণ নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

ছাত্রদের প্রথম ত্রৈমাসিক পরীক্ষা চলিতেছে। কল্যই তাহা প্রাতে সাতটায় শুরু হইল। একটী ছেলেও নকল করে নাই। একটী ছেলেও অন্যের খাতা দেখে নাই, একটী ছেলেও কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই। এমন শান্ত, স্থির, অচঞ্চল পরীক্ষার হল জীবনে দেখি নাই। Morning shows the day,—দিনটা কেমন যাইবে, তাহা প্রাতঃকালের নমুনা দেখিয়া অনেকটা বুঝা যায়। Child is father of the man,—শিশুকে দেখিয়াই বুঝা যায় যে, সে বড় হইলে কেমন হইবে। অত রৌদ্রে যে কাজ দেখিয়াছি, মনে হইয়াছে আমি যেন এক হিমশীতল বরফের ঘরে রহিয়াছি, এই সাতচল্লিশটী বালক যেন যাদুমন্ত্রে প্রখর রৌদ্রকে হিমশীতল করিয়া দিয়াছে। মানুষ তৈরী পুপুন্‌কী আশ্রমের স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমি কি আর রৌদ্রকে ডরাই? এবার বর্ষার আমি জল-ঝড়-বৃষ্টিকেও ডরাইব না। ডাক্তারেরা নিষেধ করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা মানিব না। এই বৎসরটা ত আর দ্বিতীয়বার আসিবে না। আগামী বর্ষার মধ্যে যাহা যাহা শেষ করিতে পারিব না, তাহা শেষ করিতে, কে জানে, অনেক বৎসর লাগিয়া যাইতে পারে।

তবে লোকের চিঠিপত্রের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিতেছি। চোখের ক্লেশের দরুণ অধিকাংশ পত্রই পড়িতে পারি না, তবু কত চেষ্টা

করি উত্তরগুলি লিখিয়া ডাকটিকিট খরচ করিয়া পোষ্ট করিতে। কিন্তু তাহাতে লাভ কি হইবে? ইহারা নিজ নিজ স্থানে প্রায় কেহই কাজ করিবে না, কিন্তু দিস্তায় দিস্তায় আশীর্ব্বাদ-পত্র পাওয়া ইহাদের আবশ্যক। কিন্তু আমার যে এখন নিঃসঙ্গ হওয়া প্রয়োজন। এত চিঠির জবাব দিতে গিয়া সময় নষ্ট করিলে আমি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পরিশ্রমের পূর্ণ পরিণতিটুকু সাধনের জন্য যে সময় পাইব না। কাহাকেও কোনও কাজের ভার দিয়া পত্র দিলে প্রায়ই একখানা পত্র ডাকে দিয়া কাজ হয় না। একই বিষয়ে তিন, চারি, পাঁচবার করিয়া লিখিতে হয়। এমন সব জড়-পদার্থের দ্বারা কাজ করাইবার আগ্রহ আমার কমাইয়া ফেলিতে হইতেছে। নতুবা যে চাঁদ সওদাগরের শত স্বর্ণ-ডিঙ্গি অকালে সমুদ্রের ঝড়ে ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইবে!

আজও সারা দুপুর এবং বিকাল বেলা গোধনের নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শনেই কাটাইয়াছি। প্রাতঃকালে চিঠি লিখিতে শুরু করিয়া মধ্য পথেই কাজ দেখিতে চলিয়া গিয়াছিলাম। কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পত্রখানা সমাপ্ত করিলাম। আরও কথা লিখিবার ছিল, সময় পাইলাম না। তবে একটী আশ্চর্য্য খবর লিখিতেছি যে, গুজরাটের জামনগর হইতে যে ছেলেটী আসিয়াছে, যাহার জন্ম গুজরাটে বলিয়া বাংলা লিখিতে বা পড়িতে জানে না, কাল ও আজ সে বাংলা ও ইতিহাসের পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষা সম্ভবতঃ বাকী ছিয়াল্লিশটী ছেলের তুলনায় ভাল দিয়াছে বলিয়া প্রধান শিক্ষক ফকীর চন্দ্র বটব্যাল মন্তব্য করিল। সহকারী শিক্ষক সুধীর বলিল,—এত অল্প সময়ে বাংলা হস্তাক্ষর এত সুন্দর রূপে লিখিতে এবং প্রশ্ন পত্রের উত্তর এমন ক্ষিপ্রতার সহিত দিতে দেখিয়া সে অবাক্ হইয়াছে। ছেলেটীর

নাম স্বপন গাঙ্গুলী। ধীর, স্থির, শান্ত স্বভাবের একটী আট নয় বৎসরের শিশু।

যে যতটুকু সদ্‌গুণ নিয়া আসিয়াছে, তাহার শতগুণিত সদ্‌গুণের বিকাশ-সাধনের জন্য আমরা চেষ্টা করিব। কিন্তু ছাত্রাবাসের ছাদ না হইতে, মুদ্রণালয়ের বাড়ীর কাজ শেষ না হইতে ছাত্র-ভর্ত্তি করিয়া যে ভুল করিয়াছি, তাহার কোনও প্রতীকার নাই। প্রিন্টিং মেশিন তিনখানা আসিয়া ঘরে প্যাকিং বাক্সের ভিতরে রুদ্ধ নিশ্বাসে কাল-প্রতীক্ষায় দিন গুনিতেছে। ছয় মাসের মধ্যে দেড় বছরের শিক্ষা আমি অধিকাংশ ছেলেকেই দিতে পারিতাম, যদি প্রিন্টিং মেশিন আগে বসাইতে পারিতাম। আমার শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে বিপ্লবটুকু এইখানেই। ক্যাক্‌ষ্টন প্রিন্টিং মেশিন চালু করিয়া সমগ্র ইংরাজ জাতির মধ্যে আত্মবিকাশের রাজবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমার মালটিভারসিটি বা বিশ্ববিদ্যাকেন্দ্র ছোট্ট বালকদের শিক্ষার মধ্যে প্রিন্টিং প্রেসকে ঢুকাইয়া দিয়া অভিনবতর বিপ্লব সৃষ্টি করিবে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত হাজার পত্র-লেখকের মধ্যে একজনেও আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই যে, কেন আমার বিরাট ছাত্রাবাসে লক্ষাধিক টাকা খরচ হইবার পরেও ছাদটুকু আর হইল না, প্রিন্টিং মেশিন আসিয়া পৌছিবার পরেও ছাপাখানার বাড়ীখানা তৈরী হইতে দেরী কেন হইল। অথচ ইহারা অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্নে কাণ ঝালাপালা করিয়া দিতেছিল যে, ছাত্র-ভর্ত্তি করিতে দেরী করিতেছি কেন।

ছাত্র-ভর্ত্তি করিতে আমার আরও দেরী করা উচিত ছিল। পরীক্ষা করিয়া ছাত্র নেওয়া উচিত ছিল। সরল বিশ্বাসে ভাবিয়াছিলাম, অভিভাবকেরা অসৎ, অযোগ্য, অবাধ্য, ইতর-স্বভাবের ছেলে কদাচ

পাঠাইবে না। ভাবিয়াছিলাম, ক্লাস ফাইভের উপযুক্ত ছেলেই সব পাঠাইবে। ভাবিয়াছিলাম, মনোযোগী, আত্মোৎকর্ষ বিধানে আগ্রহী, উপদেশ পালনে যত্নবান্ ছেলেই পাঠাইবে। এখন বিপদ ঘটিয়াছে যে, শিখাইব, না সংশোধন করিব? দুষ্ট ছেলে সংশোধনের জন্য ত বিদ্যাপীঠ খুলি নাই কিন্তু তিন-চতুর্থাংশ ছাত্রের পিছনে সংশোধনী চেষ্টা চালাইতে চালাইতেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি। এখানে শারীরিক শাসনের নিয়ম নাই, সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ না, আমাদের মানসিক শ্রম কত যাইতেছে। লক্ষ্য করিতেছি, ফাঁকিবাজ, স্বার্থপর পরিবার হইতে আগত ছেলেদের সংশোধনই সব চেয়ে কঠিন কাজ হইয়াছে। Family Tradition বা পারিবারিক ঐতিহ্য যদি মহৎ মনুষ্যত্বের বিকাশের অনুকূল না হয়, তাহা হইলে সেই ঘরের ছেলেকে পড়ানো যায়, মানুষ করা যায় কিনা পরীক্ষার বিষয়। পিতামাতারা অনুপযুক্ত ও অমনোযোগী ছেলেদের জোর করিয়া আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়া বা কপটতার সাহায্যে আমাদের অনুমতি নিয়া ভর্তি করাইয়া আমাদিগকে অকূল সাগরে ফেলিয়াছেন। অথচ মাষ্টারদের বেতনাদি ব্যয় মাসিক প্রায় এক হাজার টাকা আমি বহন করি। তাঁহাদের করিতে হয় না। আমরা নিঃস্বার্থ ভাবে জনহিত করিতে চাহি বলিয়াই আমাদের দিয়া অন্যায় শ্রম করাইয়া নিতে হইবে, অভিভাবকদের এই জাতীয় মনোবৃত্তি অত্যন্ত আপত্তিজনক। মাত্র একচতুর্থাংশ ছাত্র আমরা পাইয়াছি, যাহাদের জন্য পরিশ্রম করিলে সেই পরিশ্রম সমগ্র জাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কোনও দিন ছড়াইয়া পড়িতে পারিবে। ইহারাও প্রত্যেকেই খুব একটা bright career এর ছেলে ছিল না কিন্তু আমাদের অভিনব শিক্ষার গুণে ইহাদের প্রতিভা-বিকাশের দুয়ার আস্তে আস্তে খুলিয়া যাইতেছে। এই এক চতুর্থাংশ ছাত্রের ক্রমবিকাশ দেখিয়া আমরা

অধিকতর পরিশ্রম করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি। মনে হয়, ইহাদের মধ্যে একটী কি দুইটী ছেলে নিজ নিজ পূর্ব্ব বিদ্যালয়ে ভাল ছেলে ছিল কিন্তু ভাল উপাদান যাহাদের ভিতরে আছে, তাহাদের প্রত্যেককে আমরা বিদ্যার্জ্জনে, চরিত্রে, মননে ও সৃজনশীলতায় অসাধারণ করিয়া গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্পে কাজ করিয়া যাইব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২৬শে বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৮১
(১০ মে, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সুদীর্ঘ পত্র পাইলাম। * * * কাহাকেও কাহাকেও ধনসঞ্চয় করিতে দেওয়া হয়, কেহ কেহ ধনার্জ্জনে বা ধনসঞ্চয়ে দক্ষ নহে,—এই দুই কারণেই সমাজের লোকের মধ্যে আর্থিক বৈষম্য ঘটে। সম্ভবতঃ ইহার প্রতীকার মানুষের হাতে রহিয়াছে। বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সেই প্রতীকারটীকে খুঁজিতেছেন। প্রতীক্ষা করিতে হইবে যে, সত্যিকারের স্থায়ী প্রতীকার কি বাহির হয়।

কেহ জন্মিবার কালে সহায়-সম্বলহীন দরিদ্রের ঘরে জন্মে, কেহ জন্মে ধনবান্ জ্ঞানবান্ প্রতিষ্ঠাবান্ পুরুষের ঘরে, এই বৈষম্যের কারণ মানুষের

হাতে নাই। কেহ দৈবাৎ ধনবানের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়াই সে অপরাধী নহে, কেহ দৈবাৎ দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে বলিয়াই সে হেয় নহে। দারিদ্র্য যেমন অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, ব্যাধি ও অপরাধের কারণ-স্বরূপ হইয়া থাকে, অতিরিক্ত ধন তেমন বিলাস, ব্যভিচার, দাম্ভিকতা ও পরপীড়ন সৃষ্টি করিয়া থাকে। ধনবত্তা ও দরিদ্রতা উভয়েরই দোষ আছে। সুতরাং মানুষে মানুষে ধনসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সাধু-সম্মত এবং সঙ্গত। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সুখী লোকের ঘরে কেন কেহ জন্ম নিল, অথবা একই পিতামাতার ঘরে জন্মিয়াও একজন কেন দুর্মেধা ও একজন কেন শ্রুতিধর হইল, তাহার দায়িত্ব আমার, তোমার বা সমাজ-ব্যবস্থার নহে। বিজ্ঞান যদি এই বৈষম্যের প্রতীকারের পন্থা কোন দিন বাহির করিতে পারে, এই আশায় আমাদের দিন গণিতে হইবে।

কাহারও দুর্ভাগ্যের জন্য অপরকে দায়ী করিয়া চিন্তা করিতে বসা ভুল। দুর্ভাগ্যটুকুর সম্ভাবনা মুছিয়া দেওয়া যায় কি ভাবে, তদ্বিষয়ে আমাদের চিন্তা-পরিচালনা আবশ্যক। মানুষের দুর্ভাগ্য নিয়া আমরা যত আন্দোলন করিতেছি, তাহার অধিকাংশের সাথেই আমাদের হৃদয়ের যোগ নাই। কথা কহিতেছে শুধু আমাদের মস্তিষ্ক। গোল প্রধানতঃ এইখানে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫১)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
২রা আষাঢ়, সোমবার, ১৩৮১
(১৭ জুন, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার স্নেহ ও আশিস নিও।

শোনবিলের পত্রে জানিলাম, বিলে বিলে নূতন হোলি লাগিয়া গিয়াছে। ইহা শ্রীকৃষ্ণের হোলি নহে, স্বরূপানন্দ নামে একজন অখ্যাত লোকের হোলি। তাই বলিয়া ইহাতে আনন্দ কিছু কম নহে। শোনবিল এখন আনন্দ-সাগরে পরিণত হইয়াছে। চলোর্ম্মিমালা দিকে দিকে আছড়াইয়া পড়িতেছে আর মানুষের পর মানুষকে গ্রাস করিতেছে। কলিতে এই দৃশ্য ভূভারতে আর কোথাও কখনো কেহ দেখে নাই। তোমরা পবিত্র-পল্লীবাসী বিলের মানুষগুলির দিকে তাকাইয়া একটা সসম্ভ্রম নমস্কার জানাও।

এ আনন্দ তিন বৎসর কাল চালু রাখিতে হইবে। তাহারই প্রস্তুতি হিসাবে যদি মৃণাল আর মহীতোষকে ত্রিপুরা হইতে ডাকিয়া যদুপুর আনিয়া থাক, তবে বলিব, অতীব বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছ। ত্রিপুরার কাছে তোমাদের শিখিবার আছে। মৃণাল ও মহীতোষ সেই শিক্ষারই বার্ত্তাটুকু নিয়া আসিতেছে বলিয়া আমি মনে করি। শুধু বার্ত্তা নহে, আলোকবর্ত্তিকাও।

মহীতোষকে তোমরা চেয়ারে বসাইবে? চেয়ারে বসিয়া সভাপতি হইয়া নহে, সে সার্থক হইবে অজ্ঞাত অখ্যাত সাধনহীন ভজনহীন স্বরূপানন্দ নামে একটা মূর্খাদপিমূর্খের দাসানুদাস হইয়া। তাহাকে নেতৃত্ব দিও না, তাহাকে দাস হইতে দাও। নেতারা কাজ ভণ্ডুল করে, সেবকেরা সেবার দ্বারা আদর্শকে সঞ্জীবিত রাখে।

মৃণাল জলপাইগুড়ি হইতে আসিয়া হঠাৎ সকলকে তাহার বাগ্মিতা দিয়া হকচকাইয়া দিয়াছে। বেশ করিয়াছে। যাঁহার রূপাকটাক্ষে এক তুড়িতে বোবায় গান ধরে, তাঁহাতে যতক্ষণ বিশ্বাস, ততক্ষণ বাগ্মিতা ত একটা তুচ্ছ গুণ! অহং আসিলেই সব মাটি।

আমি নিজের হাতে কত বক্তা বানাইলাম আর সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের অন্তর্ধানও দেখিলাম । তোমরা মৃণাল ও মহীতোষকে সকলে মিলিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন অহং ওদের পাকড়াইতে না পারে।

তোমাদের বদরপুরের এই দ্বিতীয় সম্মেলন নিশ্চয়ই সফল হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩রা আষাঢ়, মঙ্গলবার, ১৩৮১
(১৮-৬-৭৪ ইং)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার স্নেহ ও আশিস নিও।

নিদারুণ বৃষ্টির জন্য বিলের একটী নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রে বক্তারা গিয়া উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এমনকি স্থানীয় লোকেরাও না, ইহা কোনও বিফলতার ইতিহাস নহে। বিবরণের ভিতরে আমি সফলতার জীবন্ত বীজ দেখিতে পাইতেছি। বন্যা-প্লাবিত জলময় অঞ্চলে চতুর্দ্দিগন্তের সীমা ছাড়াইয়া ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকায় দলে দলে কীর্ত্তনরত হরিওঁ-ভক্তেরা আসিয়া জমিতেছেন এবং সারি গান গাহিয়া নহে, হরিওঁ গাহিয়া, প্রবল প্রতিযোগিতায় খরবেগে ডিঙ্গির পর ডিঙ্গি চলিতেছে একটীর পিছনে একটী করিয়া আর সৃষ্টি করিতেছে ব্রহ্মার প্রথম সৃষ্টির তরঙ্গোল্লাস, এ দৃশ্য যে সিনেমায় ধরিয়া রাখিতে পারিলাম

না, ইহা একটা আফশোষ রহিল। কিন্তু বাঁচিয়া যদি থাকি আগামী কোনও বর্ষায় তোমাদের এই বন্যাবৃন্দাবনে আমি সহস্র ভক্ত লইয়া স্বয়ং একটী ডিঙ্গির হাল ধরিয়া বসিবার জন্য আসিব, আশা করিতেছি। তোমরা তোমাদের কাজ বন্ধ করিও না। কাছাড় জেলায় একাজ তিন বৎসর ধরিয়া চলিতেই থাকুক।

তোমাদের এক স্থানের সভার বিবরণে দেখিতেছি, এমন লোককে তোমরা সভাপতি করিয়াছ, যিনি তোমাদের বক্তব্য শেষ করিবার অনেক আগেই প্রত্যেককে প্রায় ধমকাইয়া অসমাপ্ত অবস্থায় বসিয়া পড়িতে বাধ্য করিতেছেন। সভাপতির চেয়ারে বসিলে যাঁহাদের দ্রুত সভা শেষ করিবার জন্য আমাশয়ের মলবেগ পায়, তেমন লোককে তোমরা সভাপতি করিতে গেলে কেন? তিনি স্থানীয় লোক, ইহাই ত তাঁহার বিশেষ গুণ? তোমরা কত দূর হইতে কত পথক্লেশ সহ্য করিয়া সভাস্থলে গিয়াছ দুইটী কথা কহিতে। শ্রোতারা যদি মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করে, তবে সভাপতির কর্ত্তব্য নহে বক্তাকে বাধা দিয়া বক্তৃতা সংক্ষেপ করিতে বাধ্য করা। যে কথা তোমরা শুনাইতে গিয়াছ, একথা আর কে এ যুগে শুনাইবে? ভবিষ্যতে তোমরা সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে বিবেচনা করিয়া কাজ করিও। যেখানে যোগ্য লোককে পাওয়া যাইবে না, সেখানে আমার প্রতিচিত্রকে সভাপতি করিয়া নিও। আমাদের কথা যতক্ষণ শুনিবার ধৈর্য্য শ্রোতার আছে, ততক্ষণ নিশ্চয়ই শুনাইবে কিন্তু শ্রোতার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইয়া একটী শব্দও বলিবে না। বক্তৃতা ছোট হইলেও কাজ দেয়, যদি তাতে কাজের কথাগুলি থাকে, মিথ্যা বাগাড়ম্বরে যদি তাহা পূর্ণ না হয়। তোমরা কাজের কথাগুলিই বলিবার জন্য সভাস্থলে গিয়াছ, বিদ্যা

ফলাইতে নহে। তোমাদের কাজ সম্যক্ সম্পূর্ণ না হইতে তোমরা স্থানত্যাগ কর কি করিয়া ?

ডিঙ্গির বহর লইয়া হরিওঁ-কীর্ত্তন করিতে করিতে যে সময়ে জলমগ্ন অঞ্চলের স্থলভূমি টিলাগুলিতে গিয়া পরিক্রমা করিয়া আসিতেছ, সেই সময়ে খেয়াল রাখিও, কোনও নৌকাই যেন অত্যধিক-সংখ্যক লোকের চাপে "খেলিয়া" না যায় অর্থাৎ ডুবিয়া না যায়। নির্দ্দিষ্ট নৌকায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী লোক উঠিতে দিও না। শুধু তামাসা দেখিবার জন্য কাহাকেও কোনও নৌকায় উঠিতে দেওয়া চলিবে না। প্রত্যেককে কণ্ঠ-সহযোগ করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া শহরে ঘন ঘন নগর-পরিক্রমা কীর্ত্তন বাহির হইতেছে, তাঁহারা আবেদন রাখিয়াছেন যে, যোগদানকারী একটী প্রাণীও মূক, মৌন, নীরব থাকিতে পারিবেন না। একদিকে যেমন বাজে কথা বলিতে থাকা নিষেধ, অন্য দিকে তেমন কীর্ত্তনে রত না থাকাও নিষেধ। বাঁকুড়ার এই অনুশাসন সর্ব্বত্র প্রচলিত হওয়া সঙ্গত।

তৎকালীন ব্রিটিশ ত্রিপুরাতে (যাহা এখন পূর্ব্ববঙ্গের কুমিল্লা জেলা) আমি নৌকাযোগে অনেক স্থানে তুমুল-কীর্ত্তন-রত নৌকার বিপুল মিছিল দেখিয়াছি। তন্মধ্যে মাঝিয়ারা গ্রামের নৌ-শোভাযাত্রার দৃশ্যটী চিরকাল আমার স্মৃতিপথে জাগরিত থাকিবে। ত্রিপুরা জেলায় যে দৃশ্য বহুবার মানুষেরা দেখিয়াছেন, তোমরা কাছাড়ে সেই দৃশ্যের অবতারণা করিয়া আমার বুকে স্নেহের জোয়ার আনিয়াছ, স্বীকার করিতে হইবে।

কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠানের পরে প্রত্যেক গ্রামেই একটী জনসভা রাখা বাঞ্ছনীয়। তোমাদের জেলা এখনো নিজস্ব বক্তা ও ব্যাখ্যাতার দল

সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ত্রিপুরা রাজ্য, ত্রিপুরা জেলা অতীতেরই [illegible], তাহা বর্ত্তমানে কুমিল্লা জেলা নামে পরিচিত, সেই ত্রিপুরার কথা বলিতেছি না, অতীতে যাহা স্বাধীন ত্রিপুরা নামে খ্যাত ছিল এবং বর্ত্তমানে যাহা ভারত রাষ্ট্রের একটী অঙ্গরাজ্য,—সেই ত্রিপুরা রাজ্য বিগত বসন্ত কালে একটা অপ্রত্যাশিত অবস্থায় পড়িয়া নিজেদের বক্তা সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা রাজ্য দশ বারোটি ভাল বক্তার জন্য গৌরব করিতে পারে। মাত্র কয়েক মাস সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের এই অগ্রগতি লক্ষণীয়। ভক্তি, বিনয়, ভালবাসা যদি থাকে, সেবার যদি ইচ্ছা থাকে এবং আচার্য্যের বাণী সমূহের তাৎপর্য্য বুঝিবার জন্য স্বাধ্যায় ও অধ্যবসায় যদি থাকে, তবে বক্তৃতা-মঞ্চে সাহস করিয়া দাঁড়াইলে আস্তে আস্তে অতি সাধারণ ব্যক্তিও একজন মনোজ্ঞ-ভাষণক্ষম বক্তায় পরিণত হইতে পারে। বক্তা নষ্ট হয় দর্পে, দম্ভে, অহঙ্কারে। বক্তার শ্রম পণ্ড হয় শ্রোতাদের প্রতি যোগ্য সম্মাননা-বোধ না থাকিলে। বক্তাকে ধৈর্য্যশীল, সহিষ্ণু এবং সদাচারী হইতে হইবে। সর্ব্বশেষ কথা এই যে, প্রকৃত বক্তার শ্রেষ্ঠ মূলধন তাহার ব্রহ্মচর্য্য। যে যতটুকু ব্রহ্মচর্য্যে নিষ্ঠাবান্, তাহার বাণী শ্রোতার কাছে তত হৃদয়গ্রাহী ও অকাট্য হইবে। নিজ জীবনের মধ্যে আদর্শের কোনও প্রতিফলন না থাকিলে কেবল ভাষার চাতুরীতে সভা মাৎ করা যায় না।

ত্রিপুরায় যাহা চলিতেছে, তাহা শোন। সভা হইল বিশালগড়, চারিদিক হইতে হরিগুণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে কত দল লোক যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে আসিলেন, কে হিসাব নেয়? বিলনিয়াতেও তাহাই হইল। উদয়পুরে (রাধাকিশোরপুরে) ত আরও আশ্চর্য্য-

জনক ঘটনা ঘটিল। সমগ্র শহরের চতুর্দ্দিকের অরণ্য-রাজিতে বসিয়া অষ্টদিকপালেরাও মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন, হরিওঁ হরিওঁ। একটা ঘণ্টার জন্য শহরটা যেন স্বর্গে পরিণত হইয়া গেল।

ত্রিপুরার কর্ম্মকৌশল কাছাড়ের ঢং হইতে একটু বিভিন্ন। তোমাদিগকে কাছাড়ের কাজে ত্রিপুরার কর্ম্মকৌশলও কতকটা অবলম্বন করিতে হইবে। ভগবান দয়া করিয়া জ্ঞানরঞ্জনকে একটা নূতন বুদ্ধি দিয়াছিলেন, তাই কাছাড় পল্লীর পর পল্লী ধরিয়া অবিরাম কীর্ত্তন-পরিক্রমা চালাইয়া যাইতেছে। ইহা এক অসাধারণ পরিণতির দিকে মানুষের মনকে টানিয়া নিয়া যাইবে। পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া যাও। নামে প্রেমে বসুন্ধরা পূর্ণ করিয়া ফেল। নামের সঙ্গে যেন অভিমান, অহঙ্কার, আত্মপ্রতারণা আবার নামাবলী গায়ে দিয়া তোমাদের সঙ্গে "মহোচ্ছবে"র প্রসাদ গিলিতে না বসিতে যায়। ভণ্ডামি-বর্জ্জিত সরল সহজ মনোভাব নিয়া প্রত্যেকে কাজ কর। কলি সর্ব্বদাই তার পাপ-সহচরদের নিয়া নামাবলির আড়ালে বা জটাজুটের অন্তরালে থাকিয়া নিজের কার্য্যসিদ্ধির সুযোগ নেয়। ঐ সকল সুবিধাবাদীদের সঙ্গে কেহ আপোষ করিও না। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৩রা আষাঢ়, ১৩৮১

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া উদ্বিগ্ন হইলাম। একেই ত ছেলে রোগে কষ্ট পাইতেছে, তার উপরে আবার গ্রহাচার্য্য আসিয়া কোষ্ঠী দেখিয়া নানা রকম আতঙ্ককর ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তুমি যে কি দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছ, ইহা ভাবিয়া আমার মনে এক কণাও স্বস্তি নাই। আমি আশীর্ব্বাদ করি, গ্রহাচার্য্যের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ মিথ্যা হউক। বস্তুতঃ ইঁহারা কাহারও ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন না, কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া একটা অসম্পূর্ণাঙ্গ বিদ্যা—জ্যোতিষ বিদ্যা—ইঁহারা বংশানুক্রমে আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন এবং মানুষও প্রথারই দাস। ইঁহারা নিজেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন না, এমতাবস্থায় পরের ভবিষ্যৎ বলিবেন কি করিয়া? ইঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া মনকে আতঙ্কে অধীর করিও না। সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন শ্রীভগবানের নাম অবিরাম জপিয়া যাও, তোমার মঙ্গল তিনিই বিধান করিবেন।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৩রা আষাঢ়, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

নামজপ, নামকীর্ত্তন, ব্যক্তিগত উপাসনা এবং সমবেত উপাসনার মধ্যে অনুষ্ঠান-গত একটু পার্থক্য আছে। যে-কোনওটাই কর না

কেন, প্রথমে "জয় জয় ব্রহ্ম" স্তোত্রটী পাঠের আগেই অখণ্ড-সংহিতার নির্ব্বাচিত অংশ পাঠ করিয়া নিবে। তারপরে "জয় জয় ব্রহ্ম" স্তোত্রটী শেষ হইলে অন্য কিছু না করিয়া জপযজ্ঞ করিতে চাহ করিলে, বা নাম-কীর্ত্তন করিতে চাহ, করিলে। তাহা শেষ হইলে জপসমর্পণ মন্ত্র পাঠ করিয়া অঞ্জলি দিয়া ঘরে ফিরিলে। সবাই মিলিয়া জপযজ্ঞ করিতে চাহ ত' দীর্ঘকাল ধরিয়া জপ করিবার এইটী উপায়। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বহু জন জপে বসিলে তবে জপযজ্ঞ হয়। কেহ দুঘণ্টার জন্যও জপ করে, কেহ উদয়াস্ত জপেরও ব্যবস্থা রাখে। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বহু জনে কীর্ত্তন করিতে চাহ, বেশ ত কর, কীর্ত্তন দুঘণ্টাও চলিতে পারে, বারো ঘণ্টাও চলিতে পারে। কিন্তু জপযজ্ঞ জপযজ্ঞই, উহা সমবেত উপাসনা নহে, কীর্ত্তন কীর্ত্তনই, উহা সমবেত উপাসনা নহে। সমবেত উপাসনায় কীর্ত্তনের কাল ও সুর একেবারেই সুনির্দ্দিষ্ট। সমবেত উপাসনায় নাম করিয়া বসিয়া তারপরে সুদীর্ঘকাল কীর্ত্তনই চালাইয়া গেলে সমবেত উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্যগুলির এবং বিশেষ করিয়া শৃঙ্খলার হানি ঘটে বলিয়াই সমবেত উপাসনা-কালে নিৰ্দ্দিষ্ট সময়ের অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কয়েক বারের বেশী কীর্ত্তন বিধেয় হয় নাই। গুরু যাহা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, শিষ্যের তাহা মানিয়াই চলা সঙ্গত, জনে জনে নূতনত্বের সঞ্চার করিতে থাকিলে তোমরা বেশী দিন কাজ করিতে পারিবে না, বৈচিত্র্যের জঞ্জালে পড়িয়া হাবুডুবু খাইবে। একদিন সমবেত উপাসনা করিবে ত' আর একদিন উপরিলিখিত নিয়মানুযায়ী বেশ ত' কীর্ত্তনই করিলে। কীর্ত্তনের প্রগ্রামে যদি কেহ সম্পূর্ণ সমবেত উপাসনা ঢুকাইয়া দেয়, তাহা হইলে তাহা যেমন অস্বস্তিকর হইবে, সমবেত উপাসনার মধ্যে তেমন কীর্ত্তনকে ঢুকাইয়া দিলে

সমবেত উপাসকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইবে। আরও যাহা যাহা হইবে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

আমাদের ডিব্রুগড় শহর আমার অনুগত শিষ্যদের সংখ্যাগৌরবে এবং তাহাদের ব্যক্তিগত খ্যাতির গৌরবে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া তোমরা মনে করিয়া থাক। এই শহরের একজন অসাধারণ প্রতিভাবান্ সঙ্গীতজ্ঞ শিষ্য বারাণসী আশ্রমে গিয়া স্নেহময়ের সহিত উপাসনায় বসিল। স্নেহময় দেখিল, এই ব্যক্তি উপাসনার স্তোত্রগুলিও কণ্ঠস্থ করিতে পারেন নাই, ছাপান বহি দেখিয়া ইহাকে স্নেহময়ের সঙ্গে সমবেত উপাসনাটী শেষ করিতে হইল। অথচ কোথাও হরিওঁ কীর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে এইরূপ গুণী গায়ক গুরুভাইকে সকলে মহাসম্মানে সমাদর সহকারে আহ্বান করিয়া থাকে। হরিওঁ কীর্ত্তনের প্রতি অত্যাসক্ত অনেককে দেখা গিয়াছে যে ইহার সুবিশুদ্ধ ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর আদৌ জানেই না বা পারে না। সমবেত উপাসনার ভিতরে নির্দ্দিষ্ট সময়ের বেশী কীর্ত্তন চালু রাখিতে হইলে চঞ্চল-মনা ব্যক্তিরা নানা সুরের কেরদানী করিয়া থাকে। ইহাতে ভবিষ্যৎ সাধক-সমূহের নিশ্চিতই গুরুতর ক্ষতি হইতেছে। কেবল বর্ত্তমানের দিকে তাকাইয়া তোমরা চলিও না। ভবিষ্যতের দিকেও তাকাও।

হরিওঁ-কীর্ত্তনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সুর এক অত্যাশ্চর্য্য রকমের সুন্দর সুর। সঙ্গীতে পারঙ্গম না হইলে সাধারণ ব্যক্তিরা ইহার মাধুর্য্য হয়ত বুঝিতে পারে না। এই জন্যই নানা রকমের তাল-ফেরতা আর রংফেরতা করিয়া গাহিবার প্রবৃত্তি হয়।

মোট কথা, কীর্ত্তনের আসর, কীর্ত্তনেরই আসর, সমবেত উপাসনার আসর, সমবেত উপাসনারই আসর। দুইটীকে একত্র মিলাইয়া খিচুড়ী পাকাইও না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

মনুষ্যকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
৩রা আষাঢ়, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা উভয়ে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

১৩৮০ সালের ৬ই পৌষ তারিখে তোমাকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলাম, মনে হয়, তাহা ভুলে ডাকে দেওয়া হয় নাই। এই জন্য নিম্নে তাহার অনুলিপিটি দিয়া দিলাম।

"মা উ—র যাবতীয় বিবরণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, তাহাকে আমার বিশেষ স্নেহ জানাও। দাম্পত্য ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমকে গভীর করিবার জন্যও সংযম আবশ্যক। অপরিসীম অসংযম বা অনিয়মিত ইন্দ্রিয়-চর্চা উভয়ের অন্তরের সম্পর্ককে অগভীর করিয়া দেয়। সংযম-পালন যে বিবাহিত জীবনে কি মধুযানের সৃষ্টি করে, তাহা যখন নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝিতে পারিতেছ, তখন ইহার গুণ ব্যাখ্যা করিয়া তোমাদের দুজনকে আমার আর কিছুই বলিবার রহিল না। নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে ব্রত-পালন করিয়া যাও। তোমার মতন আরও বহু জন আমাকে বলিয়াছে,—"হায়, এতদিন কি নরকে ডুবিয়া রহিয়াছিলাম, আজ কি স্বর্গীয় আনন্দই না অন্তরে খেলিতেছে।" অতীব সঙ্গোপনে ব্রত-পালন করিয়া যাও। নিজেদের মরম-কথা নিজেদের মরমেই রুদ্ধ রাখিয়া, বাহিরের কাহাকেও চলাংশ-মাত্রও জানিতে না দিয়া এই ব্রতের অনুশীলন করিতে হয়। তোমরা যে একদা এই

মহাব্রত নিজেদের জীবনে পালন করিয়াছিলে, তাহার প্রমাণ সমগ্র জাতির সুপ্রসারিত বাহু-যুগে তিনশত বৎসর পরে প্রকটিত হইবে। তোমাদের শুভ-সাধনার ফল জগতের বুকে এখনি ফুটিয়া উঠিতে দেখিবার জন্য কণামাত্রও ব্যগ্র হইও না। তোমরা তোমাদের ব্রতের জন্য মান চাহিও না, যশ চাহিও না, প্রতিপত্তি লাভের প্রত্যাশা করিও না, প্রশংসার জন্য লুব্ধতা অনুভব করিও না। আমি দেশ, জাতি ও জগৎকে যাহা দিতে চাহিতেছি, তাহা সাচ্চা সোণা, ইহার মধ্যে ভেজালবাজি বা মেকিদারী নাই। এই জন্যই তোমাদিগকে সংযম-সাধনা গোপনে করিতে হইবে। লক্ষ লক্ষ দম্পতী যখন গোপনে সংযম-সাধনায় সিদ্ধ হইবে, তখন এক অভাবনীয় ঘটনার মুখে সমগ্র পৃথিবী বিস্ময়ের সহিত তোমাদের পরিচয় লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।"

জনসংখ্যা-বৃদ্ধির বদ্ধমূল আতঙ্ক হইতে নহে, তোমাদের দুই জনের মধ্যে গভীর প্রেমের স্বাভাবিক ফল-স্বরূপে যে তোমাদের মধ্যে সংযমের ব্রত সুচারু রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, ইহাই তোমার দেশের, তোমার জাতির, তোমার যুগের পক্ষে এক স্থায়ি-কল্যাণপ্রদ সম্পদ। এই সম্পদ প্রাচীন ভারত অর্জ্জন করিয়াছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। তোমরা কেহ কেহ সেই অতীত ঐশ্বর্য্যকে জাতির কল্যাণে আহরণ করিতে চেষ্টিত হইয়া সমগ্র মানব-সমাজকেই লাভবান্ করিতেছ। তোমার এক গুরুভ্রাতা সম্প্রতি কাছাড় হইতে আমাকে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছে যে, ১৩৪১ বাংলা সালে যে সে আমার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল, তখন যদি তাহার সমাজের লোক তাহা জানিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার উপরে সামাজিক শাসন

হইত কিন্তু আমি ত দেখিতেছি যে, সে স্বদেশীয় সমাজ-সম্বন্ধে চতুর্দ্দিকের মানব মনকে শ্রদ্ধান্বিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। কারণ, শক্তি এবং সৌন্দর্য্য স্বতঃই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে। সংযম একটা অনুশীলন মাত্রই নহে, ইহা একটা শক্তি। ইহা শুধুই শক্তি নহে, ইহা শুচিতা। ইহা সৌন্দর্য্য। ইহা সৌভাগ্য। ইহা শান্তি ও আনন্দের উৎস। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৩৮১
(২০ জুন, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। শরীর আমার পীড়িত। ইচ্ছা মতন কাজ করিতে পারি না। তথাপি অসময়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় অপরিণামদর্শীদের আত্যন্তিক অনুরোধের চাপে নিজ বলাবল না বুঝিয়া মালটিভারসিটির দ্বারোন্মোচন করিবার ফলে অপ্রত্যাশিত দুর্দ্দৈব-সমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিক্ষুব্ধ কর্ম্ম-সাগরে গায়ের জোরে ক্ষিপ্ত উর্ম্মিমালাকে চ্যালেঞ্জ যোগাইয়া যাইতেছি। এই কারণে আহার গিয়াছে, নিদ্রা গিয়াছে, বিশ্রাম গিয়াছে, অফুরন্ত খাটুনি খাটিতে হইতেছে, তথাপি তোমাদের পত্রের উত্তর দিতে পারিতেছি না। বিলম্বের জন্য দুঃখ পাইও না বাবা। * * *

তোমার আচরণে একটী স্বচ্ছ সুন্দর মনের পরিচয় পাইতেছি। ভগবানের নামে অধিকতর লগ্ন হও। দেখিবে, মন আরও স্বচ্ছ আরও সুন্দর হইতেছে। ভগবানের নাম অন্তরে পবিত্র ভাবের উদ্দীপনা করে। এই পবিত্রতাই মানুষকে কি দেহে কি মনে পরিপূর্ণ সুন্দরতা প্রদান করিয়া থাকে। অলঙ্করণে, পুষ্পসম্ভারে, বেশভূষায় বা বর্ণালি প্রলেপাদি দানে একটী প্রাণীরও সৌন্দর্য্য বাড়ে না; সৌন্দর্য্য বাড়ে পবিত্রতায়। এই পবিত্রতারই ধ্যান আর অনুধ্যান আমি আমার ক্ষুদ্র নগণ্য জীবনটাতে চিরকাল করিয়া আসিতেছি। ইহাই তোমাদিগকে আমার প্রিয় করিয়াছে, আমাকে তোমাদের প্রিয় করিতেছে। প্রিয় বলিয়া জানিলেই কেহ কাহারও জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারে,—এমন ত্যাগ, যাহাতে প্রতিদান-বুদ্ধি নাই। তোমাদের প্রতিজনের মঙ্গল-সাধনের জন্য আমি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত একেবারে নিঃসর্ত্ত ভাবে দিয়া দিতে চাহি, বিনিময়ে ফিরিয়া কিছুই চাহি না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
৫ আষাঢ়, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কুকুর বা শৃগাল ক্ষিপ্ত হইয়া যাহাকেই দংশন করুক, তাহার শরীরে নিদারুণ বিষ-সংক্রামিত হয়। গাভীকে বা মহিষীকে যদি দংশন করে,

তাহা হইলে তাহার রক্ত এবং দুগ্ধ দুইই বিষাক্ত হইয়া যায়। অজ্ঞানতা বশত ঐ দুগ্ধ পান করিলে মানুষের দারুণ বিপদ ঘটিতে পারে। এইরূপ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে জেলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তরে সরকারী চিকিৎসার অধীন হওয়া প্রয়োজন। কারণ, অ্যান্টির‍্যাবিক ইনজেক্‌শান সিভিল সার্জ্জনের সহায়তায় সহজে শুরু হইতে পারে। তোমার পত্র পাইয়া উদ্বেগ বোধ করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করি, বিপদ দ্রুত কাটিয়া যাউক।

বাংলা দেশ বলিতে আমরা আমাদের কলিকাতা, দার্জ্জিলিং, কোচবিহার, বর্দ্ধমান আদি সমন্বিত দেশটাকেও আদিকাল হইতে বুঝিতাম। তার মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ আদি সমন্বিত পূর্ব্বাঞ্চলের অংশটুকু পাকিস্তানের কবল হইতে স্বাধীন হইয়া বাংলা দেশ নাম গ্রহণ করায়, আমাদের বড় অসুবিধা হইয়াছে। এই জন্ত আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য জন্মাবধিই পূর্ব্ববঙ্গ আর পশ্চিমবঙ্গ এই দুইটী শব্দ ব্যবহার করিতাম। কিন্তু জানিতাম যে দুই বঙ্গ মিলিয়া যে বঙ্গদেশ, তাহাই আমাদের জন্মভূমি। এই জন্মভূমির জন্ত আমাদের মধ্যে অনেকে চূড়ান্ত ত্যাগ ও অকথনীয় রাজকীয় লাঞ্ছনা স্বীকার করিয়াছে, সহিয়াছে। আমি তুচ্ছ লোক, আমি অধিক কিছু করি নাই। সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিব, সব লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করিব, এই ধ্যানটা নিরন্তর অন্তরে জাগরূক মাত্র রাখিয়াছি। অন্যেরা করিয়াছেন কাজে, আমি করিয়াছি চিন্তায়। এই জন্তই আমি তৎকালের ত্যাগী দলের একেবারে শেষের সারির নিকৃষ্টতম মানুষটী বলিয়া আজও অন্তরে একটু শ্লাঘা অনুভব করি।

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীন হইয়া যাওয়ার পরেও তোমাদের দেশত্যাগী হইয়া কেন আসিতে হইল, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

ছাব্বিশ সাতাশ আঠাশ বৎসর ত ঐখানেই মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছিলে । শোষক শ্রেণীর লোক নহ, সাধারণ গৃহস্থ, সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভিন্ন-জাতি-বিদ্বেষী লোক নহ, সকলকে সমভাবে দেখিবার শিক্ষায় নিয়াছ ছাত্রত্ব, অপরের ক্ষতি সাধন করিয়া নিজের উন্নতির লিপ্সু নহ, অপরের ক্ষতি না করিয়াও ভদ্র ভাবে কোনও প্রকারে সপরিজনে বাঁচিয়া থাকিবারই জন্য তুমি লালায়িত,—এমন নিরীহ লোককে চৌদ্দ পুরুষের ভিটামাটির মায়া ছাড়িয়া ত্রিপুরার বিশালগড়ের কাছে এক অনুন্নত পল্লীতে আসিয়া নূতন সংসার কেন পাতিতে হইল, আমি ঠিক বুঝিতেছি না। তবে কি মনে করিতে হইবে যে, খবরের কাগজে আর আকাশ-বাণী প্রভৃতির মুখে যে সকল ভাল ভাল সংবাদ প্রচারিত ও পরিবেশিত হয়, সেগুলি অমূলক ? সত্যই আমার মনে একটা খটকা লাগিয়াছে।

প্রকৃতই যাহারা মানুষ, তাহাদের লক্ষ্য হইবে বিশ্বময় ভ্রাতৃত্ব। প্রকৃতই যাহারা ধার্ম্মিক, তাহাদের অবলম্ব্য হইবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের দ্বারা সকল মানুষকে আপন বলিয়া জানিবার এবং আপন করিয়া লইবার চেষ্টা।

যাহা হউক, তুমি তোমার কর্ম্মফল নিয়া যেখানে আসিয়াছ, সেখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটী অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপন করিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। লক্ষ্য করিও,—

(১) সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা যেন ঠিক মত হয়,

(২) মণ্ডলীর ভিতরে যেন আত্মকলহ প্রবেশ না করে,

(৩) অখণ্ড-সংহিতা পাঠকে মাধ্যম করিয়া চতুর্দ্দিকে মানুষের সহিত সম্প্রীতি, মৈত্রী ও আত্মীয়তা-ভাবের যেন সম্প্রসারণ ঘটিতে থাকে,

(৪) গুরুভাই গুরুবোন্ যাহাকে পাও, তাহাকেই সাধন বিষয়ে উৎসাহ দিবে,—প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ শিষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয়টুকু গভীর ভাবে অভিনিবিষ্ট, আন্তরিকতাপূর্ণ সাধনের দ্বারা দিতে চেষ্টা করে,

(৫) গুরুভাই-গুরুবোনদের মধ্যে যেন কদাচ (ক) অনৈতিকতার অপবাদ সৃষ্ট না হইতে পারে, (খ) আর্থিক ব্যাপারে প্রবঞ্চনা বা শঠতার অভিযোগ না উত্থাপিত হইতে পারে।

তোমরা সাধন কর না বলিয়াই বুঝিতে পারিতেছ না যে, কি প্রেমমাধুরী-মাখা অমৃতময় ধর্ম্মসাধন তোমাদের হাতে আমি তুলিয়া দিয়াছি। আমি সামান্য মানুষ, কিন্তু আমাকে বুঝিতে হইলেও সাধন চাই। বিনা সাধনে কেহ আমাকে বুঝিতে পারিবে না। আমাকে না বুঝিলে আমার শিষ্যত্ব লাভ করিয়া তোমার কি গৌরব বাড়িল? ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৫ই আষাঢ়, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। পুকুর সহ বাড়ী কিনিয়াছ উপযুক্ত মূল্য দিয়া। সেই পুকুরে ক্রয়ের পূর্ব্বে আগের

মালিকের শিশু কন্যা ডুবিয়া মরিয়াছিল বলিয়া তোমাতে অশুভ সংক্রামিত হইবে কেন, বুঝিলাম না। কোনও পুকুরে সাপ, ব্যাং ছাগল বা কুক্কুরাদিও মরিলে জলকে স্বাস্থ্য তত্ত্বসঙ্গত ভাবে শোধিত না করিয়া সেই পুকুরের জল কখনো ব্যবহার চলে না। অন্য কোনও দোষ পুকুরে ঘটে নাই যে, আতঙ্কিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হইবে। দ্রব্য তার মূল্যদানের দ্বারা শুদ্ধ হয়। কিন্তু তার মানে এই নহে যে, যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ছাগ মূল্য দিয়া কিনিয়াছ বলিয়াই তাহার যক্ষ্মারোগ সারিয়া গেল। এমন ছাগের মাংস বা এমন ছাগীর দুগ্ধ বিষতুল্য। পুকুরটিকে উপযুক্ত লোকের উপদেশ-ক্রমে ভেষজাদি দ্বারা শুদ্ধ কর এবং কিছুকাল পরে নিশ্চিন্তে উহার জল সর্ব্বকার্য্যে ব্যবহার কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

৫ই আষাঢ়, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। সান্ত্বনাও নিও, কারণ তুমি শোকার্ত্ত।

একটী মেয়ের সহিত ভালবাসা হইয়াছিল, পরস্পর বিবাহের প্রতিজ্ঞাও করিয়াছিলে কিন্তু এখন মেয়েটীর অন্যত্র বিবাহ হইতেছে দেখিয়া তুমি মামলা করিয়া মেয়েটীকে জিতিয়া নিবার কল্পনা করিতেছ। ইহা কিন্তু প্রেমিকের যোগ্য কাজ হইল না। বিচ্ছেদ ও বিরহ-বেদনাকে

প্রকৃত প্রেম শাশ্বত সত্য বলিয়া স্বীকার করে। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম মিলনোৎসব নহে, বিরহোচ্ছ্বাস। এই বিরহই রাধার প্রেমকে নিখিল ভুবন-জয়ী করিয়াছে। বিরহে দগ্ধ হইয়া হৃদয় অঙ্গার হইয়া গিয়াছে, তাতেও আনন্দ,—কৃষ্ণ কালো, অঙ্গারও কালো। কি বিচিত্র বিচার। ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

সত্যই যদি কাহাকেও ভালবাসিয়া থাক, তবে তাহার জীবনের সুখ-পথে কণ্টক হইও না। তাহাকে সুখী হইতে দাও। তোমার এই ত্যাগ তোমাকে মহনীয় করিবে।

বিবাহ এমন একটা ব্যাপার, যাহা এদেশে কেবল বর আর বধূর উপরে নির্ভর করে না। সুতরাং বিবাহ হইল না বলিয়া ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, আক্রুষ্ট ও হিতাহিতবোধশূন্য মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে প্রবেশ করিও না। যাহাকে মামলায় জিতিবার জন্য আগ্রহাতিশয্যে অধীর হইয়াছ, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মামলায় জিতিবার পরে হঠাৎ দেখিয়া অনুতপ্ত হইবে যে, তাহার প্রতি তোমার আর প্রেম নাই। দেখিবে, যাহাকে চাহিয়াছিলে, সে আসে নাই, তাহারই দেহে আসিয়াছে আর একটা স্বতন্ত্র মানুষ। দেখিবে, যাহাকে পাইতে চাহিয়াছিলে, হাতের মুঠার মধ্যে তাহাকে পাও নাই, বাহুর বেষ্টনে তাহাকে পাও নাই, বুকের মাঝে তাহাকে পাও নাই; পাইয়াছ মাত্র প্রাণহীন তাহার কঙ্কালটাকে। মানুষ নিয়াই মানুষের প্রেম, কঙ্কালকে প্রেম কেহ করে না, করিতে পারে না।

আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি আরও কিছু বলিব এবং তোমার ব্যথিত মনকে শান্ত করিয়া দিব। কাল-প্রতীক্ষা কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বাত্রিংশতম খণ্ড

(৬০)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৫ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮১
(১ আগষ্ট, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কর্ত্তব্য-ব্যপদেশে নিজ কাজে আটক হইয়া রহিয়াছ, মালটিভারসিটির ছাত্রদের দেখিয়া যাইবার অবসর পাইতেছ না। তোমার অনবসর অবস্থাকে গর্হণ করি না, কিন্তু বিদ্যার্থীরা প্রায় সকলেই তোমাকে তাহাদের মধ্যে একান্ত আপন করিয়া পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করিয়া উৎফুল্ল হইয়াছি। আদর্শের মোহন-বংশী শুনাইতে পারিলে ইহারা একদা দেশ ও জগতের বহু মঙ্গল-কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা ঋত্বিক্ হইতে পারিবে।

কিন্তু অনেকের অভিভাবকেরাই এই ইঙ্গিতের ধারকাছও যে ঘেঁষেন নাই, ইহা কিছু কিছু অশিষ্ট ছাত্রের আচরণ হইতে বুঝিতেছি। সুবিধাবাদী অভিভাবকদের কেহ কেহ নিজ নিজ দুষ্ট, দুশ্চিকিৎস্য, অবাধ্য ও অসুন্দর-স্বভাব ছেলে এখানে কাপট্যের আশ্রয়ে ভর্ত্তি করাইয়া দিয়াছেন মনের এই সংগুপ্ত আশায় যে, আমাদের ত অন্য কোনও করিবার মত কাজ হাতে নাই, অতএব এই সকল দুর্দ্দান্ত ছেলেকে সংশোধন করিবার দায়িত্বটা আমাদের ঘাড়েই পড়িলে ছেলেগুলির কল্যাণ হইতে পারে।

সম্প্রতি একটী ঘটনায় এখানকার ছাত্র ও শিক্ষক মহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের ও মনোবেদনার সৃষ্টি হইয়াছে। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার

১০

কোনও এক জেলার একই গ্রাম হইতে দুইটী বালক এখানে ভর্ত্তি হইয়াছিল। তাহারা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যায়। বাড়ী যাইবার কালে ইহাদের মধ্যে কোনও গুরুতর ঘনিষ্ঠতা ছিল না কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশের পরে ফিরিবার পথে এই দুইটী ছেলে অনেক অভি-ভাবকের সঙ্গে আশ্রমে আসে। আসিয়া কান্না জুড়িয়া দেয় যে, বাড়ী ফিরিয়া যাইবে। বড় ছেলেটার তালে পড়িয়া ছোট ছেলেটা এমন গোল্লায় যায় যে, তাহার কুপরামর্শে একদিন অতি গোপনে জামা-কাপড় বনের ভিতর রাখিয়া আসিয়া সকলকে দেখাইয়া গামছা পরিয়া বাহির হয়। ভাবটা এই, যেন পাইখানাতে যাইতেছে। যখন খোঁজ পড়িল, ছেলে দুইটী নাই, তখন ইহারা বাসে চাপিয়া, ট্রেণে উঠিয়া কলিকাতার পথে পাড়ি জমাইয়া ফেলিয়াছে। আশ্রমের ছাত্র, এই কথা বলিয়া ইহারা বাসের কণ্ডাক্টার ও ট্রেণের চেকারের দয়া আকর্ষণ করাতে ভাড়া ফাঁকি দিতে সমর্থ হইয়াছে। কি উদ্বেগের ছায়া যে সমস্ত আশ্রমটীতে পড়িল, বলিবার নহে। দিন কতক আগে বোধ হয় এক সপ্তাহ পার হয় নাই, বাহির হইতে একটা অনিন্দনীয় স্বভাবের সুন্দর ছেলে আসিয়া মঙ্গল-সাগরে ডুবিয়া মারা গিয়াছে, এই শোকের পরে, এই পলায়নের ফলে সকলের উদ্বেগের ও অশান্তির কথা চিন্তা কর। আমরা কলিকাতা গিয়া জানিলাম, দুটী ছেলেই বড় ছেলেটীর এক আত্মীয়ের বাড়ী রহিয়াছে। কুপরামর্শ দিয়া যে ছেলে অন্য স্বল্পতর বয়সের অবোধ শিশুকে আশ্রম হইতে গোপনে বাহির করিয়া নিয়া যায়, এমন স্বভাবের ছেলেকে যে প্রধান শিক্ষক সহজে ক্ষমা করিতে পারেন না, ইহা তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পার। কিন্তু ছোট ছেলেটীর পিতা আসাম হইতে ছুটিয়া আসিয়া ছেলে সহ আশ্রমে ঢুকিলেন। ছেলেটাকে কত

বুঝা, কত প্রবোধ, কত সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা হইল, আমরা জনে জনে কত মিষ্টি ভাবে কত কথা বলিলাম, কিন্তু ছোট ছেলেটা তার মন্ত্রণাদাতা বড় ছেলেটার নির্দ্দেশেই চলিবে, সে আশ্রমে থাকিবে না। দেশে তার মাতা নিজ পুত্রের এই আশ্রম-ত্যাগের কথা শুনিয়া অবধি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছেন, কিন্তু পুত্রের তাহাতে গ্রাহ্য মাত্র নাই। আমাদের তরফ হইতে কত প্রকার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা এই শিশু ছাত্রের পিতার নিজ মুখ হইতেই একদা শুনিতে পাইবে। অবোধ পুত্রের পিতা কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রম ত্যাগ করিলেন। আইনতঃ বাধ্য না হইলেও সহৃদয়তা বশতঃ আমরা তাহাদের জমা দেওয়া টাকা ফেরৎ দিয়া দিলাম।

কিন্তু ব্যাপারটা কি এইখানেই শেষ হইয়া গেল? ঘটনাটা আমাদিগকে বিশেষ ভাবে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, অকাতরে শ্রম দিয়া আয়ুক্ষয় করিব আমরা কাহার জন্য? কেমন ছেলের জন্য? কেমন পিতামাতার ছেলের জন্য? শ্রম করিব আমরা কতটা? তাহার কি সীমা বাঁধিয়া দিতে হইবে না? ইহাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সংশিক্ষা বিধানের জন্য আমরা নিজেদের পকেট হইতে কত টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করিব? শিক্ষকের বেতন মাসে হাজার টাকা আমি একাকী বহন করিয়া আসিতেছি। প্রাসাদোপম দালানে ইহাদের সীট-ভাড়া লাগে না। বিদ্যুতের বিল মাসিক একশত টাকা আমিই বহন করি। প্রথম ছয় মাস এই পঞ্চাশ-ষাটটী ছেলের খোরাকী খরচের অতিরিক্ত অংশ জন প্রতি পঁচিশ টাকা হিসাবে আমি নিজ পকেট হইতে চালাইয়াছি। এজন্য কোনও অভিভাবকের নিকট হইতে একটা ধন্যবাদেরও প্রত্যাশা রাখি নাই।

ইহা ত গেল অন্ধকার দিক্। কিন্তু আলোর দিকটাও আছে, যাহা বর্ণনা না করিলে তুমি সম্যক্ জানিতে পারিবে না। বর্দ্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার অখণ্ডগণ আমাকে আশ্রমাভিমুখগামী কোনও ট্রেণে চাপিতে দেখিলে ঝুড়ির পর ঝুড়ি আর বস্তার পর বস্তা ভোজ্যসামগ্রী ও খাদ্যোপকরণ ট্রেণে তুলিয়া দেয়। বর্দ্ধমান জেলার বোধ হয় চারিটার বেশী ছাত্র আশ্রমের বিদ্যাপীঠে নাই, বাঁকুড়া জেলার আছে মাত্র দুই জন। গতকাল বাঁকুড়া জেলার কুস্থলিয়া অঞ্চলের কৃষক-অখণ্ডেরা আত্মানন্দের সহিত পঞ্চাশ ষাটটী বড় বড় কুমড়া পাঠাইয়া দিয়াছে বিদ্যার্থীদের সেবার জন্য। আশ্রমের কোনও বৈষয়িক প্রয়োজনে ইতিমধ্যে বাঁকুড়া ও কলিকাতা গিয়াছিলাম, দিন আমার কাটিয়াছে অধিকাংশ সময়ে বিছানায় শুইয়া, কারণ শরীর বড় দুর্ব্বল। কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি করিয়াছি। কিন্তু আমি বাঁকুড়া হইতে পুপুন্কী আসিবার দিন প্রায় তেত্তাল্লিশ বস্তা তরিতরকারী বাঁকুড়া, সোনামুখী, ভড়া, বড় কুরশা, সানবান্ধা ও খাত্ড়ার ছেলে-মেয়েরা ট্রেণে তুলিয়া দিয়াছে। কলিকাতা হইতে পুপুন্কী ফিরিবার দিন বর্দ্ধমান, আসানসোল, বার্ণপুর ও অণ্ডালবাসীরা ট্রেণের সমস্ত কামরাটাই ত্রিশ চল্লিশটী বস্তা ও টুকরীতে ভরিয়া দিয়াছে। ছাত্রদের সেবার জন্য নেপাল নাগ দশ সের মিহিদানা দিয়াছিল, বর্দ্ধমান হইতে দুর্গাপুরের মধ্যে কোনও স্থানে ভদ্রবেশী দুর্ব্বৃত্তেরা তাহা লুট করিয়া খাইয়াছে, এই একটুখানি গ্লানি ছাড়া, ব্যাপারটায় অন্য কোথাও অশোভনতা ছিল না। বর্দ্ধমানের দর্শনার্থীরা সুশৃঙ্খল ছিলেন না বলিয়াই এই দস্যুতাটা ঘটিতে পারিল। নতুবা শক্ত হাতে আমি ইহা নিশ্চয়ই দমন করিতাম।

আর বিদ্যার্থীরা? পুপুন্‌কী আশ্রম স্বাবলম্বী-বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা দেখিতেছে, আমি নিজে এই পীড়িত শরীরেও গিয়া মাঠে কাজ করিতেছি। ইহা কি তাহাদের অন্তরে প্রেরণার সঞ্চার করিতেছে না? প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে কেবল কতকগুলি উচ্চাদর্শের বুলি ঝাড়িয়াই আমি আমার কর্ত্তব্য শেষ করিতে পারিতেছি না। যাহা বলিয়াছি বা বলিব, তাহাকে কাজেও রূপ দিতে আমি চেষ্টা করিতেছি। তাহাকে নিজ জীবনের প্রত্যক্ষ পরিশ্রমের দ্বারা দৃষ্টান্তীকৃতও করিতে চাহিয়াছি। সাধ্য কি ধনীর দুলাল কোনও ছাত্রের এই আবেদনকে অগ্রাহ্য করার? মাঠের পর মাঠে বীজের পর বীজ বপন এবং অঙ্কুরোদ্গমের পরে প্রতিটি চারার গোড়ায় মৃত্তিকা প্রক্ষেপ,—একাজ ইহারা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে প্রত্যহ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমার চোখের উপরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া করিয়া যাইতেছে। কাল বিকালে চারি পাঁচ শত পুইএর চারা ইহাদেরই দ্বারা যথাস্থানে বসান হইল, আড়াই তিন বিঘা জমি জুড়িয়া চিনাবাদামের ক্ষেতে ইহারাই মাটি দিল,—বীজও ইহারাই পুতিয়া দিল।—মনের আনন্দে ইহারা কাজ করিতেছে, কাজ শিখিতেছে, আবার মাঠের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কেবল কৃষিই নহে, ক্লাসের পড়াও কতক কতক রসাল ভাবে আলোচিত হইতেছে। তুমি একবার আসিয়া ইহাদের মধ্যে থাকিয়া গেলে বড়ই ভাল হইত। শিশুদের জীবন-গড়ার সহায়তা করা আর নিজের জীবনকে প্রাণরসের প্রাচুর্য্যে ভরিয়া দেওয়া প্রায় এক কথা। তিন চারি দিন জোর কৃষিকার্য্য করিবার পরেই ইহাদের কৃষি-শ্রম হঠাৎ একেবারে কমিয়া যাইবে। কারণ, বর্ষা শুরু হইয়া বেশ ভাল ভাবে নামিতে না নামিতেই আবার প্রখর রৌদ্র আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতি—আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬১)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুনকী আশ্রম
১৮ শ্রাবণ, রবিবার, ১৩৮১
(৪ আগষ্ট, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। ক্ষণকাল আগে তোমার নামীয় এক পত্র ডাকে দিয়াছি। এই পত্র তাহার বিশদ বিস্তার মাত্র।

তোমরা নানা বিপজ্জনক প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের মধ্যেও জীবন বিপন্ন করিয়া সভা-সমিতি, পাঠ-কীর্ত্তন, সঙ্গীত ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি কাজ অকুতোভয়ে এবং অক্লান্ত চেষ্টায় কাছাড়ের বিরাট জলাকীর্ণ বিল অঞ্চলে করিয়া যাইতেছ জানিয়া তোমাদের প্রতি আমার অন্তহীন স্নেহের সমুদ্র যেন উচ্ছ্বাসে উল্লাসে উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অকারণ বিপদ-বরণের মধ্যে কোনও সার্থকতা নাই। সুতরাং অতিরিক্ত দুঃসাহস দেখাইয়া দুর্য্যোগময়ী অন্ধকার রজনীতে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝাতাড়িত বিল অতিক্রম করিবার চেষ্টা কদাচ করিও না।

তোমাদের কোনও কোনও সভা সভাপতির আচরণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে জানিয়া দুঃখ বোধ করিলাম। এই পদটীতে কাহাকেও আরোপিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহার সম্পর্কে সকল খবর জানিয়া শুনিয়া কাজ করা ভাল। যিনি তোমাদের তত্ত্বের ও তথ্যের কোনও খবরই রাখেন না, হঠাৎ এমন লোককে সভাপতি পদে বরণ করিলে তিনি নিজেও যে বিপন্ন হইয়া ভুল আচরণ করিয়া ফেলিতে পারেন, এই কথাটী মনে রাখিতে দোষ কি? সভাপতিরা যে সময়ে সভার

উদ্দেশ্যের ক্ষতি করেন, সেই সময়ে নির্ব্বাক্ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য গতি কিছু থাকে না। সকলে সভাপতি হইবার যোগ্যতাও রাখেন না। কিন্তু সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য সভাপতির বা অধ্যক্ষের অধিকাংশ সময়েই প্রয়োজন হয়।

তুমি তোমার ছাত্রদের বক্তৃতাদান শিক্ষা দিবার যে পরিকল্পনাটী করিয়াছ, তাহা উত্তম। তোমার জেলাতে বাগ্মিতার জন্য আর যাহারা যাহারা প্রখ্যাত হইয়াছে, এই ব্যাপারে তাহাদের সহিত প্রত্যক্ষ ভাবে যোগাযোগ করিয়া পরিকল্পনার পরিমার্জ্জন বা পরিবর্দ্ধন করিয়া কিছু কাল কাজ চালাইয়া যাইবার পরে অভিজ্ঞতা হইতেই নূতন দিগদর্শন পাইবে। নূতন নূতন বক্তা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা সতাই প্রয়োজন।

সভাস্থলে বক্তারা পরস্পর পরস্পরের কথার কেবল পুনরুক্তি করিতে থাকিলে সভার অবস্থা একঘেয়ে হইয়া যায় এবং শ্রোতাদের হয় শুনিতে অরুচি। আগে হইতেই বক্তব্য বিষয়গুলি ভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বক্তাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাতে বক্তব্যের মৌলিকতা শ্রোতাদের শুনিবার ইচ্ছাকে উদ্দীপিত করিয়া চলে। এক বক্তা অপর বক্তার বক্তব্যের বিরোধ করিয়া কিছু বলিলে সভায়োজন পণ্ড শ্রমে পরিণত হয়। ফুটবল খেলায় যেমন ব্যাক যায় না গোল রাখিতে, গোলকীপার যায় না ফরোয়ার্ডে দৌড়াইতে, সভায়োজনে বক্তাদের পারম্পরিক শৃঙ্খলা ও সম্বন্ধ তদ্রূপ হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যই যেন শ্রোতার নিকটে নূতন বিস্ময়ের বা নূতন আনন্দের হেতু হয়। সকলের সকল বক্তব্যকে একটী পরিধির মধ্যে আনিয়া আলোচনা করিয়া সংক্ষিপ্ত চুম্বকে সর্ব্ববিষয়

শ্রোতাদের বোধগম্য করিয়া দেওয়াই সভাপতির আসল কর্ত্তব্য। তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতা বা প্রতিভার আলোকে তিনি যদি তাঁহার ভাষণকে আরও সমুজ্জ্বল করিতে পারেন, তবে তাহা তাঁহার এক অতিরিক্ত কৃতিত্ব।

যে কাজ ধরিয়াছ, তাহাকে দীর্ঘপ্রযত্নে একযুগ ধরিয়া সমপ্রযত্নে চালু রাখিতে হইবে। আমি ধৈর্য্যে, কালপ্রতীক্ষার শক্তিতে, অধ্যবসায়ে ও একনিষ্ঠায় বিশ্বাসী। হঠাৎ প্রতিভার ক্ষণপ্রভার মূল্য আমার বাজারে নাই। তোমরা বসিয়া থাকিও না। ঘুমানো আরও অন্যায়। জাগিয়া ঘুমান জগতের সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠতা।

ভাষণ-শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকের মনে এই কথাটী অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিও যে, ভাষণের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হইলে (ক) অখণ্ড-সংহিতা শত শত বার পড়িতে হইবে, (খ) ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে, (গ) অহঙ্কার-বর্জ্জিত আত্মবিশ্বাস অর্জ্জন করিতে হইবে, (ঘ) পৃথিবীর নানা স্থানে পরিকীর্ণ হইয়া আছে যত রকমের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, তাহাদের প্রত্যেকটীর প্রতি অপক্ষপাত ও বিদ্বেষহীন থাকিতে হইবে এবং (ঙ) জগদ্ব্যাপী শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার কামনায় প্রত্যহ নিজ উপাসনা-কালে জগন্মঙ্গল-সঙ্কল্প করিতে হইবে। এভাবে প্রস্তুত হইয়া যাহারা ভাষণ দিতে উঠিবে, তাহাদের জ্ঞান, বিদ্যা, পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা বা কবিত্ব থাকুক বা না থাকুক, তাহাদের কথা কাণ পাতিয়া জগদ্বাসী শুনিবেই শুনিবে।

বিলাতে ও মার্কিণ প্রভৃতি দেশে বক্তৃতা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার স্কুল আছে, কলেজ আছে, অধ্যাপক আছে, অগণিত পুঁথি-পুস্তক আছে। আমাদের দেশে তাহা নাই। তাহার প্রয়োজন আছে বলিয়াও মনে করি না। বিদ্যা হিসাবে বক্তৃত্বকে আয়ত্ত করিয়া দরিদ্র বক্তারা ত

কেবল ধনী শোষকদের হস্তধৃত ক্রীড়নক বা His Master's Voice হইয়া বিবেক-বিরুদ্ধ বাণী প্রচার করিয়া কায়ক্লেশে জীবিকার্জ্জন করিবে। আমি চাহি, আমার অনুগামীদের বাগ্মিতাশক্তি ও বক্তৃতা-বিদ্যা তাহাদের জীবন-সাধনার একটী পরিপূরক অনুষঙ্গ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬২)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম
১৮ শ্রাবণ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার দুই বৎসর পূর্ব্বেকার পত্রের আজ জবাব দিতেছি। এতদিন পড়িবার সময় পাই নাই। কত চিঠি আসে আর চেষ্টা সত্ত্বেও পড়া হয় না। স্তূপ জমিয়া যায়। তবু মাসে পাঁচ শত টাকা ডাক-খরচ ত করি। তোমরা ইহাকে অবহেলা বলিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বড় মানুষেরা আমাকে ঘিরিয়া থাকে, এই জন্য ছোটরা কাছ ঘেঁষিতে পারে না, একথা তোমার ন্যায় আরো বহু জনে লেখে। ইহার ত জবাব দিবার উপায় নাই। দিলে, মনে কষ্ট পাইবে।

পত্র সংক্ষেপে লিখিলে জবাব তাড়াতাড়ি মিলিবার সম্ভাবনা বেশী। কারণ, পত্রটা আদ্যোপান্ত না পড়িয়া ত জবাব দেওয়া সম্ভব নহে। সঙ্গতও নহে। ছোট পত্র দিলে তিন শতখানা লিখিতে পারি,

বড় পত্র বিশ পঁচিশ ত্রিশখানা লিখিতে না লিখিতে রাত্রি বারোটা বাজিয়া যায়। তারপরে হইলেও শরীরটা কিছু বিশ্রাম নিবে, এতটুকু প্রেস্ তোমরা আমাকে নিশ্চয়ই দিতে রাজি হইবে। সারাদিন যখন মাঠের কাজ করি না, তখন কেবল পত্রই ত লিখি। তোমারই কাছে না লিখিলেও তোমার কোনো ভ্রাতার কাছে বা ভগিনীর কাছে লিখি। দিনে রাত্রে একটা মিনিটও আমার আলস্যে কাটে না।

কলিকাতা আসিয়া দেখা করিতে ভিড়ের ঠেলায় ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিয়া যাও বলিয়াই ত আমি মাঝে মাঝে তোমাদের মধ্যে নিজে ছুটিয়া যাইতে চাহি। কিন্তু সেখানে গেলেও ত ঐ একই অপবাদ। তুমি নিজেকে নগণ্য গৃহস্থ মনে করিতেছ কিন্তু অন্যেরা তোমাকে ধনপতি কুবের বানাইয়া নিন্দার ফুলঝুরি ছড়াইবে। তোমার ঘরে গিয়া আমি উঠিলে তুমি কি জনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও শৃঙ্খলার বিধান করিবে না? করিলেই ত আবার অন্যেরা নানা কথা বলিবে। বল, সমাধান কোথায়?

আমার যে তোমাদের অঞ্চলগুলিতে যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যাওয়া হইয়া ওঠে না, তাহার প্রধান কারণ তোমাদের অপ্রস্তুত অবস্থা। কেহ কোথাও কোনও কাজ কর নাই বা করিতেছ না। কাজ-করা জায়গায় গেলে যত অল্প সময়ে অধিক আনন্দ আস্বাদন করা যায়, কাজ-না-করা জায়গায় গেলে তত অল্প সময়ে তত অধিক বিরক্তি আহরণ করিতে হয়। শরীরের বয়স আর স্বাস্থ্যের অবস্থা চিন্তা না করিয়াও আমি সুযোগ পাইলে অখ্যাত অজ্ঞাত নবাবিষ্কৃত পল্লীগুলিতে একবার করিয়া ঢু মারিয়া আসিবার চেষ্টা করি। কিন্তু তোমরা তজ্জন্য অনুকূল কর্ম্ম করিতেছ কোথায়? অধিকাংশ স্থানেই ত তোমাদের আত্মকলহ

শহর আর পল্লীর পথগুলিকে কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে ভরিয়া ফেলিতেছে। যাওয়া কি সহজ ব্যাপার রহিয়াছে? যেখানে একটীও পরিচিত প্রাণী নাই, বরং সেই স্থান শ্লাঘ্যতর মনে হয়।

তোমার গুরুভ্রাতারা কখনো তোমার খোঁজ নিতে আসিলে তুমি তাহাদের ভ্রাতৃভাবের মূল্যায়ন করিতে বসিয়া ভাবিতে পারিতেছ যে, নিষ্ঠাহীনের ভ্রাতৃভাবের দাম কতটুকু। এই একটী থার্ম্মোমিটার দিয়াই ত তুমি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিতে পার যে, আমি কেন প্রতি স্থানে উন্মত্ত মৃগের মতন দ্রুত চরণক্ষেপে ছুটিয়া যাইতে পারিতেছি না। আমারও মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে, তোমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃভাবের যেখানে নিদারুণ অভাব, সেখানে আমি গিয়া নিজ পিতৃত্ব ফলাইব কিসের মহিমায়?

তবে তোমাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্বে আমি আস্থাশীল। তোমাদের ভিতরে যদি সাধনের শক্তি জাগ্রত হয়, তবে কণ্টক-বনকে তোমরা নিশ্চয়ই নন্দন-কাননে রূপান্তরিত করিতে পারিবে। সাধনে একাগ্র হইলে বিশকাটালীকেও বনস্পতির রূপ ধারণ করাইতে পারিবে।

সুতরাং আমার একটী মাত্রই আকূতি, তোমরা সাধনশীল হও। আমার একটী মাত্রই আকিঞ্চন, তোমরা সাধনশীল হও। আমার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আর কখনও আসিতে পার আর না পার, তোমাদের সাধনশীলতাই তোমাদিগকে আমার পক্ষে পরম লোভনীয় করিবে। আমার স্নেহশীলতা বা বিরূপতার দিকে না তাকাইয়া, আমার মনোযোগ ও অমনোযোগের দিকে লক্ষ্য না দিয়া, আমার সমাদর বা অবহেলার সমালোচনা না করিয়া, আমার সম্পর্কে সম্পূর্ণ রূপে নির্লিপ্ত ও নিঃস্পৃহ হইয়া তোমরা সাধন চালাইয়া যাও। আমি যদি সত্য বস্তু হইয়া

থাকি, তবে তোমার সাধনার সিদ্ধি-মুহূর্তে আমাকে নিশ্চয়ই আমার পূর্ণ সত্তায় পূর্ণ স্বরূপে পূর্ণ মহিমায় তোমার মধ্যে পাইবে। আমি যদি মিথ্যা হইয়া থাকি, তবে আমাকে চিরবিস্মরণে রাখিলে কাহার কি ক্ষতি ? ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্কী আশ্রম
১৮ শ্রাবণ, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। তাহার নাম রাখিও "স্বাগত"। আমি তাহাকে সজ্জীবনের এবং দীর্ঘ পরমায়ুর আশীর্ব্বাদ করিতেছি। জন্মকালের হিসাব অনুযায়ী পঞ্জিকাতে তাহার সম্পর্কে কুকথা বলা হইয়াছে দেখিয়া তুমি উদ্বিগ্ন হইয়াছ। রাশি, বর্ণ, দশা, নক্ষত্র আদিরও এক প্রভু আছেন। সেই পরমপ্রভুর শরণাপন্ন হও, সব—ফাঁড়া, সব বিপদ, সব আতঙ্ক কাটিয়া যাইবে। প্রেম সহকারে পরমেশ্বরে নির্ভর কর, ভূতনাথের ভূত-প্রেতগুলিকে দেখিয়া ভয় পাইও না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা আশ্বিন, বৃহস্পতিবার, ১৩৮১
(১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। এই সেই দিন মাত্র তোমরা দীক্ষা নিয়াছ। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাবে মানব-সমাজের কল্যাণ-কল্পে কাজ করিবার জন্য অন্তরে আবেগ অনুভব করিয়াছ দেখিয়া আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছি। এই সাধন যে পায়, তাহাকে জগতের কল্যাণে কেবল সঙ্কল্প করিয়া গেলেই চলিবে না, কাজও কিছু করিতে হয়। তুমি পাঠ রূপ জ্ঞান-বর্দ্ধক সেবাটির মধ্য দিয়া কাজ শুরু করিতে চাহ দেখিয়া তোমার বুদ্ধিমত্তায় প্রশংসমান হইয়াছি।

অনেক স্থানেই অখণ্ডমণ্ডলীর সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অখণ্ড-মহিলা-সমিতিও কাজ করিয়া যাইতেছে। এই দৃষ্টান্তে তুমি অনুপ্রাণিত হইয়া তোমাদের অঞ্চলে একটা মহিলা-সমিতি গড়িতে চাহ। কিন্তু প্রথমেই এত বড় কাজে হাত না দিয়া পাঠ-প্রকল্প দ্বারা মহিলাদের মিলনের অভ্যাসটীকে আগে অনুশীলনে আনিতে চাহ এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে একটী মহিলা-সমিতির রূপ তাহাতে দিতে চাহ। এই প্রস্তাব অত্যন্ত সদ্‌বুদ্ধি-সঙ্গত ও বাস্তবানুযায়ী হইয়াছে। হঠাৎ একটা সমিতি করিয়া প্রথমেই নানা রূপ জটিলতার অথৈ জলে পড়িয়া

যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। পাঠ-প্রকল্পের মধ্য দিয়া তোমাদের মধ্যে প্রগাঢ় ঐক্যের জন্য একটী ব্যাকুল অভীপ্সা জাগরিত হইলে তখন একটা সমিতি গঠন করা বা তাহা সুন্দর ভাবে পরিচালিত করা খুব কঠিন ব্যাপার হইবে না।

নানা স্থানের মহিলা-সমিতিগুলি প্রথম প্রথম উদ্দাম স্বাধীনতা আস্বাদন করিয়াছে। পরে দেখা গেল যে, স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর সহিত স্থানীয় মহিলা-সমিতির সংযোগ সুনিবিড় ও সহযোগ আন্তরিক না হইলে এই দুইটী প্রতিষ্ঠান পরস্পর পরস্পরের শক্তি হরণ করে। মণ্ডলী গঠন বা সমিতি গঠন কোনোটারই প্রকৃত উদ্দেশ্য ত তাহা নহে। এই জন্য সমিতি গঠন করিবার কালে নিজ নিজ স্থানীয় মণ্ডলীর সহিত অবিচ্ছেদ্য যোগাযোগের ব্যবস্থা করিয়া কাজে নামা উচিত।

যে সঙ্কল্প করিয়াছ, তাহা সৎ। আশীর্ব্বাদ করি, সিদ্ধকাম হও।

ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা আশ্বিন, ১৩৮১

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

পরিস্থিতির প্রয়োজনে আমি নিজ দায়িত্বে যোগ্য কর্ম্মী পাঠাইয়া তোমাদের অখণ্ডমণ্ডলীর পুনর্গঠন করাইয়া দিয়া আসিয়াছি। এখন

তোমাদের প্রত্যেকের কর্ত্তব্য হইতেছে এই মণ্ডলীর সহিত প্রেমভরে সহযোগ করা। এই সহযোগের ফলে উদ্ভূত প্রীতিপূর্ণ আবহাওয়াতে একই শহরে আস্তে আস্তে পরস্পর-সহযোগী দুই তিন বা চারিটি পৃথক্ পৃথক্ অখণ্ডমণ্ডলী গঠন কঠিন বা অসম্ভব ব্যাপার নহে। ভবিষ্যতের যে-কোনও কুশলপ্রদ ব্যাপারকে অবাধ সম্ভাবনা প্রদান করিবার জন্যই বর্ত্তমান মণ্ডলী আমার অনুমোদন পাইয়াছে। আর, বর্ত্তমান নবগঠিত মণ্ডলীর কর্ম্মকর্ত্তাগণও কেহই নিজ নিজ পদে চিরস্থায়ী হইতে পারেন না, সবই সাময়িক। তোমরা গুরুর নির্দ্দেশ পালনের মধ্যে কুতর্ক, কুযুক্তি বা জিদের প্রাচুর্য্য ঘটাইয়া তোমাদের শহরের ভাবী সম্ভাবনা-সমূহকে কেহ নষ্ট করিও না। আমি রাজনীতি বা তদুচিত জটিল কর্ম্মপন্থাগুলি বুঝিও না, অনুমোদনও করি না। তোমরা অবনত মস্তকে আদেশ পালনের দ্বারা নিজেদের সম্প্রীতির শক্তি বর্দ্ধিত করার চেষ্টা কর। পরবর্ত্তী সংযোজন, পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও নবায়ন সবই আস্তে আস্তে আপনা আপনি হইতে পারিবে। বদ্ধমূল বিদ্বেষ ও দৃঢ়মূল বৈরবোধের মধ্য দিয়া যেখানে মণ্ডলীর কাজ চলে এবং চরম সততা রক্ষায় যেখানে চেষ্টা নাই, সেখানে আমার অনুমোদন সম্ভব নহে কিন্তু আনুগত্যের সহিত সংমিশ্রিত অবস্থায় যখন সম্প্রীতি ও সততা দেখিতে পাই, তখনই আমি আমার সানন্দ অনুমোদন প্রেরণ করিয়া থাকি।

বর্ত্তমান অনুমোদিত মণ্ডলীর পদাধিকারীদের প্রতিও আদেশ এই যে, তাহাদিগকেও অতীতের অপ্রীতিকর কথার চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া সকলের আহ্বানে সকলের গৃহে সমবেত উপাসনায় প্রীতি সহকারে যোগ দিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)